সর্ব্বনাশের নেশা

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স

৯০।২ এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

১৩৩০

মূল্য ১।৵০

প্রকাশক
শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার
পক্ষে
এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স
১০।২এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কান্তিক প্রেস
২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত

স্বর্গগত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সুহৃৎসত্তমেষু

ভাই সত্যেন,

তুমি যে আমার কত আপনার ও আবশ্যক ছিলে তা প্রতি-দিনের অভাবে ক্রমে ক্রমে স্পষ্টতর বুঝ্‌তে পার্‌ছি। তোমার বিচ্ছেদ-বেদনা নিত্য নবীন হয়ে আছে। প্রতিদিন আমি তোমার সঙ্গে পরলোকে মিলনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি এই সান্ত্বনা।

তোমারই নাম-রাখা যে বই লিখ্‌তে লিখ্‌তে তোমার অসুখে বন্ধ করেছিলাম, তা আজও বহু চেষ্টাতেও শেষ কর্‌তে পারিনি। আজ তোমার সাম্বৎসরিক-শ্রাদ্ধ-দিনে তোমাকে কিছু দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি পরের লেখা ধার করে' নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। তুমি অনুবাদের জাদুগর ছিলে, তোমাকে এই তুচ্ছ উপহার দিতে সঙ্কোচ বোধ কর্‌ছি। কিন্তু ব্যথিত বন্ধুর শ্রদ্ধা-উপহার তুমি অবহেলা কর্‌বে না আমি জানি।

কলিকাতা

তোমার সখ্যগর্ব্বিত চারু

১০ই আষাঢ়, ১৩৩০

কৈফিয়ৎ

এই উপন্যাসের নায়ক মীর খাঁ ঐতিহাসিক সত্য ব্যক্তি। তাহাকে মৃত বা জীবিত ধরিবার জন্য ব্রিটিশ-গভর্মেণ্ট ও বড়োদা-রাজ পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। মীর খাঁ হিন্দুকুশ হইতে বড়োদা-রাজ্য পর্য্যন্ত নিজের প্রভাবে ভীতিপ্রদ হইয়া বিচরণ করে। আজ পর্য্যন্ত কেহ তাহাকে গেরেপ্তার করিতে পারে নাই। এই মীর খাঁয়ের নাম ও কীর্ত্তিকাহিনী আজকালকার খবরের কাগজে প্রায়ই দেখা যায়।

এই মীর খাঁ ও ভারতসীমান্তের আরো অনেক ডাকাতের নাম ও কাহিনীর সঙ্গে স্পেন দেশের একটি গল্প মিশাইয়া এই বই লিখিয়াছি। স্পেন দেশের সেই গল্পটি অবলম্বন করিয়া ফরাসী ঔপন্যাসিক প্রস্প্যার্ মেরিমে 'কার্মেন্' নামে একটি উপন্যাস্ লেখেন এবং ফরাসী নাট্যকার জর্জ্ বিজে একখানি নাটক লিখিয়া প্রসিদ্ধ হন। সেই নাটক ইংরেজীতেও অনুবাদিত ও অভিনীত হয়, অল্পদিন আগে কলিকাতাতেও অভিনীত হইয়া গিয়াছে।

আমরা এই বইএর বর্ণনার সঙ্গে পাঠকপাঠিকাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় করাইবার জন্য পঞ্জাবসীমান্তের লোক ও স্থানের কয়েকটি ছবি পুস্তক-মধ্যে সন্নিবেশিত করিলাম। প্রবাসী-সম্পাদক পূজনীয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া প্রবাসীর কয়েকখানি ব্লক ছাপিবার অনুমতি দিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনাটি প্রসিদ্ধ চিত্রকর, আমার স্নেহভাজন বন্ধু, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়ের।

সর্ব্বনাশের নেশা

— ১ —

আর্য্য পিতামহদের আদি বাসভূমি, প্রথম বেদ-সূক্ত-মুখরিত গান্ধার দেশ, বৌদ্ধযুগের প্রসিদ্ধস্থান ; পাণিনির জন্মস্থান, প্রাচীন-কালের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় তক্ষশিলা ; সূর্য্যপূজা প্রবর্ত্তনের মূলস্থান মূলতান ও মগ ব্রাহ্মণদের প্রথম বাসভূমি প্রাচীন নগর পুরুষপুর বা পেশোয়ার প্রভৃতি পঞ্জাব-প্রান্তের প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দেখিবার বাসনা বহুদিন হইতে মনে প্রবল হইয়া ছিল। আমাদের বন্ধু প্রভাস দাস যখন পেশোয়ারে ইস্‌লামিয়া কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া গেলেন ও আমাদের টাট্‌কা তাজা বেদানা আঙুর প্রভৃতি মেওয়া খাওয়াইবার লোভ দেখাইয়া সেখানে যাইবার নিমন্ত্রণ করিলেন, তখন চারু-রায় ত কল্পনাতেই রস-সম্ভোগ করিয়া অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষে মুখভরা রস-শোষণের শব্দ করিয়া বলিয়া উঠিল—"আ—আঃ!" চারু চিত্রকর, সে কল্পনার রঙীন

তুলিতে যে চিত্র অঙ্কিত করিতে লাগিল তাহাতে বন্ধু-মজ্‌লিশে হাসির ফোয়ারা উৎসারিত হইয়া উঠিল।

একবার শীতের ছুটির পর প্রভাস-বাবুর যখন পেশোয়ারে ফিরিবার সময় হইল, তখন আর কোনো বন্ধুর তেমন উৎসাহ আগ্রহ দেখা গেল না—তাঁহাদের সকলেরই একই উত্তর রেল-কোম্পানী যাওয়া-আসার খেয়ার কড়ি যাহা আদায় করিবে তাহাতে এখানে জীবন-ভোর বেদানা আঙুর সপরিবারে খাওয়া চলিবে।

কবি সত্যেন্দ্র রঙ্গরসিক ঋষি-কবির উক্তি আবৃত্তি করিলেন—

"মনে বাঞ্ছা বিদেশ ভ্রমণে
কিন্তু পাথেয় নাস্তি!
পায়ে শিক্‌লি মন উড়ু উড়ু,
একি দৈবের শাস্তি!
টঙ্কা-দেবী যদি করে কৃপা
না রহে দুঃখ জ্বালা!
বিদ্যা বুদ্ধি কিছুই কিছু না
কেবল ভস্মে ঘি ঢালা!"

কাহারো উৎসাহ নাই দেখিয়া আমি স্থির করিলাম—"একা যাব পেশোয়ার করিয়া যতন!" চারু আমার সংকল্প দেখিয়া দোমনা হইয়া দু-একবার টাল-মাটাল করিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বাড়ীর মায়া আর সে ত্যাগ করিতে পারিল না।

সর্ব্বনাশের নেশা

পেশোয়ার-যাত্রার ভ্রমণ-কাহিনী পরে পাঠকপাঠিকাদের সুবিধামত উপহার দিব ; এখন শুধু সেখানে গিয়া যে একটি নূতন অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলাম ও একটি নূতন ধরণের গল্প শুনিয়াছিলাম তাহাই আপনাদের বলিব।

প্রভাস-বাবু চাকরী করেন। কাজেই আমি একলাই দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়া বেড়াইতেছিলাম। তক্ষশিলা দেখিয়া জম্রুদ চলিয়াছি। আমি ছেলেবেলাতেই একটু ফার্সী পড়িয়াছিলাম ; তার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এম-এ পরীক্ষা প্রবর্ত্তনের সময় বাংলার অন্যতম মূলাশ্রয় ভাষা বলিয়া যখন পশ্তু ভাষা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তখন বাংলার সঙ্গে পশ্তুর কি সম্পর্ক জানিবার কৌতূহলে পশ্তু ভাষারও একটু আলোচনা করিয়াছিলাম ; তার পর কোনো নূতন দেশে গিয়া সে-দেশের ভাষার গোটা-কতক কাজ-চলা শব্দ চট্ করিয়া শিখিয়া লইবার একটা স্বাভাবিক শক্তি আমার আছে ; এই সাহসে আমি একটা পাঠানী পোষাক কিনিয়া সেদেশী সাজিয়া লইয়াছিলাম।—ঢিলা অথচ প্রচুর কুঞ্চিত পাজামা, লম্বা ঢিলা কোট, পায়ে চাপ্লি জুতা, মাথায় উচ্চ ক্রমশঃ-সরু কুল্লা টুপি ঘিরিয়া ফিরোজা রঙের জরিদার পাগ্ড়ী পরিয়া কাবুলীর খুড়তাত ভাই সাজিয়া চলিয়াছিলাম। দুইটা ঘোড়া ভাড়া করিয়াছিলাম, আর ভাড়া করিয়াছিলাম একজন রাহ্বর বা রাহ্নুমা পথপ্রদর্শক ; একটা ঘোড়ায় চলিতেছিলাম আমি, আর অন্য ঘোড়ায় চলিতেছিল আমার পরিচালক রাহ্বর ও

সর্ব্বনাশের নেশা

আমার একটা চামড়ার ব্যাগ—তাহার মধ্যে ছিল এক প্রস্থ বাঙালী সজ্জা ও এক প্রস্থ য়ুরোপীয় সজ্জা, কিছু খাদ্যসামগ্রী ও কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথের খান দুই বই।

তৃণগুল্মহীন উষর পার্ব্বত্য পথে বরাবর চড়াই ও উৎরাই চড়িয়া নামিয়া শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, মাথার উপর সূর্য্য অসহ্য বোধ হইতেছিল, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল—সঙ্গে থার্মস্ বোতলে যে জলটুকু ছিল তাহার শেষ বিন্দুটুকুও অনেকক্ষণ আগেই শুষিয়া গলা ভিজাইয়াছি। তখন আর্য্য পিতামহদের প্রতি মনের ভাবকে ভক্তি এবং ইতিহাসের প্রতি মনের ভাবকে অনুরাগ কিছুতেই বলা যায় না! অল্পদূর গিয়াই পথের পাশে একটা জায়গায় কয়েকটা গাছ, বিচ্ছিন্ন লতাগুল্ম ও সবুজ ঘাস দেখিয়া চোখ যেন জুড়াইয়া গেল, তৃষ্ণা যেন অর্দ্ধেক উপশম হইল; এতক্ষণ কেবল পাথর আর কাঁকর দেখিয়া দেখিয়া চোখ যেন কর্কর্ করিতেছিল। আমার পরিচালক রাহ্‌বর সেই জায়গাটা দেখিয়াই বলিয়া উঠিল—সাহেব, এখানে পানী পাওয়া যাইবে, ওখানে ফওয়ারা আছে।

আমি ঘোড়ার লাগাম টানিয়াছিলাম কি না ঠিক জানি না, ঘোড়া যেন আমার মনের বাসনা বুঝিতে পারিয়া নিজের ইচ্ছাতেই পথ ছাড়িয়া সেই বৃক্ষচ্ছায়াশীতল শষ্পাস্তীর্ণ জলসিক্ত স্থানটির দিকে অগ্রসর হইল। একটা পাহাড়ের দেওয়াল ঘুরিয়া ফিরিতেই দেখিলাম সেই পাহাড়ের পায়ের তলায় খানিক দূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়া অল্প জল জমিয়া আছে,এবং দুটি পাশাপাশি

খাড়া পাহাড়ের মাঝখানের সরু গলি দিয়া একটি ক্ষীণ জলধারা বহিয়া আসিয়া সেই জলায় পড়িতেছে। পাহাড়ের গলির মধ্যে কিছুদূর অগ্রসর হইলে—ঝর্ণার মূল উৎস না পাইলেও—আবদ্ধ জলার জল অপেক্ষা স্রোতের ভালো পরিষ্কার জল পাইব বিবেচনা করিয়া আমি সেইদিকে ঘোড়াকে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিলাম, কিন্তু সে বেচারার আর তর্ সহিতেছিল না, সে জলার ঘোলা জলেই গলা ভিজাইয়া লইবার আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। আমি তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে অগ্রসর হইতে আবার তাগাদা করিতেই সে বিরক্তিকর্কশ স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। ঘোড়ার হ্রেষারবের জবাবে আর-একটা ঘোড়া নিকটেই কোথায় ডাকিয়া উঠিল—আমি কিন্তু সে ঘোড়াটাকে কোথাও দেখিতে পাইলাম না।

আমি পাহাড়ের মধ্য দিয়া একশ কদম অগ্রসর হইতে না হইতেই এক অপরূপ দৃশ্য আমার চক্ষুর সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়া পড়িল! একটা গোল জায়গা ঘিরিয়া ঢালু পাহাড় বৃত্তাকারে দাঁড়াইয়া আছে, ঘটের মুখের মতন একদিকে কেবল একটু সরু গলি-পথ সেই গোল সমতল ক্ষেত্রের সহিত বাহিরের সংযোগের সুবিধা করিয়া রাখিয়াছে; ঢালু পাহাড়ের গা ঘাস ও গুল্মলতায় সমাচ্ছন্ন সবুজ, তাহার একদিক্‌কার বুক চিরিয়া গলা হীরার ধারার মত একটা ঝর্ণা ক্ষীণ ধারায় উৎসারিত হইয়া পাথর হইতে পাথরে ঝাঁপ দিতে দিতে পর্ব্বতপাদমূলে ঝরিয়া পড়িতেছে। পিপাসার্ত্ত

সর্ব্বনাশের নেশা

পথশ্রান্ত পথিকের বিশ্রামের জন্য মাতা বসুন্ধরা যেন তাঁর কোমল কোল পাতিয়া বক্ষামৃত ক্ষরণ করিতেছেন! কিন্তু এই মনোরম স্থান আবিষ্কার করার গৌরব আমার একার নয়। একজন লোক আগেই আসিয়া সেই স্থানের কোমল শষ্পশয্যায় শুইয়া বিশ্রাম করিতেছিল—আমি সেখানে আসার আগে বোধ হয় ঘুমাইতেছিল। ঘোড়ার চীৎকারে তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল; আমাকে তাহার বিজন বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটাইতে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সে উঠিয়া তাহার ঘোড়ার কাছে গেল। ঘোড়াটি তাহার প্রভুর নিদ্রার অবসরে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণের প্রচুর আয়োজন দেখিয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত সঞ্চয়ে ব্যাপৃত ছিল। সেই লোকটি যুবক, মাঝারি আকারের, দৃঢ়-গঠন, বলিষ্ঠ; তাহার সুন্দর মুখ রৌদ্রদগ্ধ, চিন্তাক্লিষ্ট, দুঃখমলিন, কিন্তু গর্ব্বব্যঞ্জক। তাহার কোমরে একটা ছোরা, হাতে একটা প্রকাণ্ড বন্দুক, গলায় একটা চামড়ার কাবুলী ব্যাগ হাত গলাইয়া ডান পাশে ঝোলানো।

বাস্তবিক বলিতে কি, এই বিজন স্থানে অস্ত্রধারী ঐ লোকটির ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া আমার হৃৎকম্প হইয়াছিল—লোকটা ডাকাত না কি! এই পার্ব্বত্য পাহাড়িয়া দেশে পাঠান আফ্রিদি ওয়াজিরি মাশুদ ওরাকৃজাই কাবুলী বেলুচী ব্রাহুই যাহাকেই দেখি তাহাকেই ডাকাত বলিয়া আতঙ্ক হইতে হইতে ডাকাতের ভয়টা একরকম গা-সহা হইয়া গিয়াছিল; আর লোকটা যদি বাস্তবিকই ডাকাত হয় তবে আমার সম্বল ব্যাগটা লইয়া তাহার বিশেষ কিছু লাভ

বা আমার বিশেষ কিছু ক্ষতি হইবে না—বাঙালী বা সাহেবী পোশাকেই বা তাহার কি দরকার, আর রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ আমার কাছে বহুমূল্যবান্ হইলেও তাহার কাছে উহার কি বা মূল্য !

এই কথা ভাবিয়া লইয়া আমি সেই লোকটিকে সেলাম করিয়া বলিলাম—সেলাম আলেকম্ আঘা ! আমি কি আপনার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটাইলাম ?

লোকটা আমার সম্ভাষণের কোনো জবাব না দিয়া রূঢ় স্থির দৃষ্টিতে একবার আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল ; তার পর যেন আমার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্ট হইয়া আমার সহচর পরিচালকটিকেও ঠিক সেই একই রকম সন্দিহান দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিয়া লইল। আমার পরিচালক রাহ্‌বর আমার কিছু পিছনে পড়িয়া গিয়াছিল ; আমি দেখিলাম সে অগ্রসর হইতে হইতে ঘোড়ার লাগাম টানিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার মুখ ফ্যাকাশে পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহার চোখে মুখে সর্ব্বাঙ্গে বিষম ভয়ের গভীর কালো ছায়া পড়িয়াছে ! তাহার ভয়স্তম্ভিত মূর্ত্তি দেখিয়া আমারও ভয় হইল—বুকের মধ্যটা একবার গুড়গুড় করিয়া উঠিল, ভাবিলাম—কী দুর্দ্দৈব ! বিষম অযাত্রা দেখিতেছি !

কিন্তু তখনই সুবুদ্ধির পরামর্শে সাবধান হইয়া ভয় বা বাহিক চাঞ্চল্য দমন করিয়া ফেলিলাম। আমি ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িলাম, আমার পরিচালক রাহ্‌নুমাকে ঘোড়া দুটাকে খুলিয়া

ছাড়িয়া দিতে বলিয়া ঝর্ণা-ধারার মধ্যে সমস্ত মাথাটা ডুবাইয়া জলপান ও স্নান করিতে লাগিলাম।

আমার চোখ কিন্তু ছিল আমার রাহ্‌বর ও অচেনা লোকটির দিকে। রাহ্‌বর অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল বটে, কিন্তু ভয়ে অবিশ্বাসে ইতস্তত করিতে করিতে। আমাদের প্রতি অপরিচিত লোকটির কোনো বিরুদ্ধভাব প্রকাশ পাইল না, সে ঘোড়ার লাগাম ছাড়িয়া দিয়া বন্দুকের নল নীচু করিয়া এবার সহজভাবে দাঁড়াইয়া আমাদের দেখিতে লাগিল।

সে যে আমার সম্ভাষণের জবাব দেয় নাই বা আমাকে প্রতি-নমস্কার করে নাই, তাহার এই তাচ্ছিল্য গ্রাহ্য না করিয়া আমি রুমালে মাথা মুছিয়া পুরু ঘাসের বিছানায় চিতপটাং হইয়া শুইয়া পড়িলাম, এবং পকেট হইতে সিগার-কেস বাহির করিয়া একটা চুরুট লইয়া দাঁতে তাহার এক প্রান্ত কাটিতে কাটিতে অপরিচিত লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনার ব্যাগে দেশলাই কি চক্‌মকি আছে?

সে তখনো একটিও কথা না বলিয়া তাহার ব্যাগ খুলিয়া তাহার মধ্যে হাতড়াইতে হাতড়াইতে আমার নিকটে আসিল। এবং ব্যাগ হইতে একটা চক্‌মকি পাথর, একটা লোহা ও এক টুক্‌রা সোলা বাহির করিয়া সোলায় আগুন ধরাইল, এবং সোলায় ঘন ঘন ফুঁ দিতে দিতে আমার চুরুটের কাছে ধরিল। কিন্তু সে তখনো বন্দুক ছাড়ে নাই, এক হাতে ধরিয়াই ছিল।

আমার চুরুট ধরানো হইলে, আমি আমার সিগার-কেস্

হইতে সব-চেয়ে ভালো একটি চুরুট বাহির করিয়া অপরিচিতের দিকে বাড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম—আপনি কি অনুগ্রহ করিয়া একটা চুরুট গ্রহণ করিবেন ?

সে চুরুটটা গ্রহণ করিয়া এইবার প্রথম কথা কহিল—"লুৎফ্-ই-শুমা জিয়াদ্ (আপনার অশেষ অনুগ্রহ) !" এবং একটু নত হইয়া সেলাম করিল। এবং চুরুটটা ধরাইয়া আবার নত হইয়া সেলাম করিয়া পরম পরিতোষের সহিত চুরুটের ধূমপান করিতে লাগিল।

খানিকক্ষণ পরে একটা সুখটান টানিয়া নাক মুখ দিয়া কুণ্ডলা-কৃতি ধোঁয়া ছাড়িয়া সে বলিল যে বহুত রোজ সে তাম্বাকুর আস্বাদ পায় নাই ; আজ আমার মেহেরবানীতে তাহার দিল্ বড়ই খুশী হইয়াছে !

অপরিচিত ব্যক্তি কাহারো নিকট হইতে তামাক লইলে তাহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হইল বলিয়া বুঝাই এ-দেশের রীতি। সুতরাং এই ডাকাত যে আমার হাত হইতে চুরুট লইল তাহাতে আমার বুকের উপর হইতে একটা জগদ্দল পাথরের মতন গুরুভার বিষম দুর্ভাবনা নামিয়া গেল।

লোকটা খুব বক্তা। সে মুখ খুলিয়াই আমার সঙ্গে খুব বকিতে আরম্ভ করিল। আমার ফার্সী-পশ্তু ভাষার পুঁজি শীঘ্রই ফুরাইয়া গেল। আমি যে বিদেশী তাহা ধরা পড়িয়া গেল। আমি এখন ফার্সী পশ্তু উর্দ্দু হিন্দীর খিচুড়ি বানাইতে লাগিলাম। সে বলিল যে সে এদেশী ওরাকৃজাই জির্গার লোক,

কিন্তু আমার তাহা বিশ্বাস হইল না; কারণ সে এই স্থানের নাম বলিতে পারিল না, নিকটে কোথাও গ্রাম বা লোকালয় আছে কি না তাহা সে জানে না, এবং তক্ষশিলা পুরুষপুর বা মূলস্থান সম্বন্ধে কোনো সংবাদ ত তাহার জানা থাকিবার কথাই নহে। গল্প করিতে করিতে লোকটি আমার ঘোড়ার সঙ্গে নিজের ঘোড়ার তুলনা করিয়া বলিল—"আপনার ঘোড়াটা কোনো কর্ম্মের নয়।" আমার বাহনটির এই গুণ আবিষ্কার করাতে কাহারো যে কিছুমাত্র বাহাদুরীর পরিচয় দেওয়া হয় এ বিশ্বাস না থাকাতে আমি ঈষৎ হাস্য করিলাম; সে বলিতে লাগিল—"কিন্তু আমার ঐ যে ঘোড়া দেখিতেছেন, উহা একদিনে এক ছুটে আমাকে নব্বই মাইল পথ বহিয়া লইয়া আসিয়াছিল!" এই কথাটা বলিয়া ফেলিয়া লোকটি কেমন থতমত খাইয়া গেল, এই কথাটা যেন তাহার বলা উচিত ছিল না, সে অসতর্ক হইয়া বলিয়া ফেলিয়া অন্যায় করিয়া বসিয়াছে! একদিনে নব্বই মাইল দৌড়াইয়া যাইবার সঙ্গত কারণ দেখাইবার জন্য সে বলিল—একটা তামাদির মকদ্দমা ছিল—সেদিন পেশোয়ার না পৌঁছিলে বড়ই লোক্‌সান হইয়া যাইত।

এই কথা বলিয়াই সে আমার সঙ্গী রাহ্‌নুমা পরিচালকের দিকে তাকাইল। রাহ্‌বর তাহার দৃষ্টির আঘাতে চোখ নামাইয়া দৃষ্টি নত করিল।

অপরিচিত লোকটার বকুনিতে আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এই ছায়াশীতল স্থানে ঝর্ণার ঝরঝরানি

ঘুমপাড়ানি গান আমার সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করিয়া আনিতেছিল। আমি একটু কিছু খাইয়া একটু ঘুমাইয়া লইব স্থির করিলাম। আমার ব্যাগ খুলিয়া একটা কৌটা হইতে তোফা ঘি-মাখা মোটা রুটি, মাংসের কালিয়া, ও খানিকটা পেস্তা-বাদাম-কিশমিশ-দেওয়া বাদ্‌শাহী হালুয়া বাহির করিয়া একখানি কাগজের উপর রাখিলাম। এদেশের নিয়ম—খাইবার সময় উপস্থিত বা আগন্তুক লোককে আহারের ভাগীদার হইতে আমন্ত্রণ করিতে হয়; নিমন্ত্রণ না করা শত্রুতার লক্ষণ। আমি অপরিচিতকে নিমন্ত্রণ করিয়া বলিলাম—মেহেরবানী করিয়া আমার সঙ্গে কিছু খানা খাইবেন কি ?

এ দেশের নিয়মে কাহারো নিমক খাওয়া তাহার সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধুত্বে বদ্ধ হওয়া একই কথা। যাহার মনে অনিষ্ট-অভিসন্ধি বা শত্রুতা করিবার বাসনা থাকে সে কিছুতেই নিমক খাইতে স্বীকৃত হয় না। কিন্তু সেই অপরিচিত তৎক্ষণাৎ রাজি হইয়া নত হইয়া সেলাম করিয়া আবার বলিল—"লুৎফ্‌-ই-শুমা জিয়াদ !" এবং এই বলিয়াই সে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মতন হাঁউ হাঁউ করিয়া রোটি-গোশ্‌ৎ গিলিতে লাগিল। তাহার খাওয়ার ব্যগ্রতা ও ধরণ দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম বেচারা অন্ততপক্ষে দুদিন অনাহারে ছিল ! মনে হইল তাহাকে বাঁচাইবার জন্যই ভগবান্ আজ আমাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। তাহার ক্ষুধার বহর ও আহারের আগ্রহ দেখিয়া আমি অল্পই খাইলাম। আমার সঙ্গী পরিচালক ত আরো কম খাইল এবং একটিও কথা বলিল না,

যদিও সারা পথ সে বকর-বকর করিয়া বকিয়া আমাকে জ্বালাতন করিতে করিতে আসিয়াছে। আমার অপরিচিত অতিথির উপস্থিতি যেন তাহার বাক্‌রোধ করিয়া দিয়াছিল এবং একটা কিসের অবিশ্বাস ও সন্দেহ যেন তাহাদের উভয়কেই পীড়া দিয়া গা মেলিতে দিতেছিল না। ইহার কারণ আমি আন্দাজে কতক কতক ঠাহর করিতে পারিতেছিলাম—অপরিচিত লোকটা বোধ হয় খুনী ডাকাত এবং আমার পরিচালক বোধ হয় উহাকে চিনে। সে যাই হোক, আমার কিন্তু আর ভয়ের কিছুমাত্র কারণ নাই, খুনী ডাকাত আমার হাত হইতে লইয়া তামাক খাইয়াছে এবং আমার সঙ্গে এক পাত্রে নিমক খাইয়াছে। এখন সে আমার দোস্ত্‌!

আহার শেষ করিয়া আমরা উভয়ে আবার চুরুট ধরাইলাম। আমি পুরু ঘাসের গালিচার উপর সটান শুইয়া পড়িয়া আমার পরিচালককে ঘোড়ায় জিন কষিতে বলিলাম।

পরিচালক তৎপরতার সহিত আমার আজ্ঞা পালন করিয়া দুই হাতে দুই ঘোড়ার মুখ ধরিয়া টানিতে টানিতে আসিয়া হাজির, সে যেন এখান থেকে পালাইতে পারিলে বাঁচে।

আমি অপরিচিতকে সেলাম করিয়া বিদায় লইলাম—খুদা হাফিজ (ভগবান্‌ আপনাকে রক্ষা করিবেন)!

অচেনা লোকটি এবার প্রতিনমস্কার করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—আজ রাত কাটাইবেন কোথায়?

আমি আমার পরিচালকের ইসারার নিষেধ বুঝিবার আগেই

বলিয়া ফেলিলাম—খাইবার-পাসের অপর মুখে ডাক্কা পর্য্যন্ত যাইতে না পারিলে পথেই কোনো সরাইয়ে রাত কাটাইব।

সে বলিল—ডাক্কা পর্য্যন্ত আজ যাইতে পারিবেন না—সন্ধ্যার আগে অতদূর যাওয়া ঐ ঘোড়ার কর্ম্ম নয়। পথে চটিতেই থাকিতে হইবে। কিন্তু আপনার মতন আমীর ব্যক্তির বাসের উপযুক্ত স্থান এখানকার চটি নয়। আমিও ঐ পথের রাহী, আমাকে যদি আপনার রাহ্‌বরী করিতে দেন ত আমি আপনার সঙ্গী হই।

"খুশীসে" বলিয়া আমি ঘোড়ায় উঠিয়া পড়িলাম। আমার রাহ্‌বর আমার ঘোড়ার মুখ ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সে আবার আমাকে ইঙ্গিত করিল। আমি সে ইঙ্গিতের উত্তরে কেবল একটু হাসিয়া তাহাকে জানাইলাম যে আমার মন বে-পরোয়া নিশ্চিন্ত আছে।

আমরা রওয়ানা হইলাম।

আমার রাহ্‌বরের রহস্যপূর্ণ ইঙ্গিত ও তাহার অস্বস্তির ভাব, অপরিচিত পথের সাথীর দুশ্‌মন চেহারা ও একদিনে ৯০ মাইল ঘোড়দৌড়ের খবর এবং তাহার একটা গোঁজামিল কারণ প্রদর্শন আমার মনের মধ্যে আমার পথের সাথী অতিথির সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছিল যে সে একজন ডাকাত এবং আমরা তাহার পাল্লায় পড়িয়াছি। কিন্তু তাহাতে কি ? আমি বন্ধু প্রভাস-দাসের কাছে এ দেশের গল্প শুনিয়া বুঝিয়াছিলাম এ দেশের যে লোক কাহারো সঙ্গে এক পাত্রে নিমক খায় সে লোক

কখনো তাহার অনিষ্ট করে না। সুতরাং এই ডাকাত হইতে আমার ভয়ের ত কোনো কারণই নাই, বরং সে সঙ্গে থাকাতে অপরের কাছ হইতেও আমার কোনো অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই, আমার পথ একেবারে নিরাপদ্। অধিকন্তু একজন সত্য-কারের ডাকাতের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ হওয়াতে আমার ঔপন্যাসিক মন খুশীই বোধ করিতেছিল। ডাকাতের সাক্ষাৎলাভ ত সুলভ ও স্পৃহণীয় নয়; সেই ডাকাত যখন তাহার ভয়ঙ্করতা-বর্জ্জিত হইয়া দেখা দেয় তখন হিংস্র বাঘ পোষার আনন্দ অর্জ্জন করা যায়।

আমি সুদূর বাংলা মুলুকে মসীজীবী নিতান্ত নিরীহ প্রাণী, ন-তাকৎ দুব্‌লা, কাহারো ঝগড়া-ঝঞ্ঝাটের ত্রিসীমানায় থাকি না—গল্প লিখিয়া রুজি রোজ্‌গার করি,—পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে এইদেশে আমাদের পূর্ব্বপিতামহদের বাসস্থান ছিল, তাহারই পয়মাল বা ধ্বংস-চিহ্ন দেখিতে এই দেশে আসিয়াছি,—ইহা শুনিয়া আমার নূতন বন্ধু হঠাৎ এমন করিয়া হাসিয়া উঠিল যেন কেউ একটা বাঁশকে বিষম বলে চড়চড় চড়চড় চড়াৎ করিয়া অকস্মাৎ চিরিয়া ফেলিল। সেই হাসিতে আমার রাহ্‌বর এমন চমকিয়া উঠিয়াছিল যে সে ঘোড়া হইতে আর-একটু হইলে পড়িয়াই যাইত।

আমার ডাকাত বন্ধুর মনে আমার নিরীহতা ও অকর্ম্মণ্যতা সম্বন্ধে আর সন্দেহ নাই দেখিয়া আমি এদেশের ডাকাতদের গল্প পাড়িলাম। অবশ্য খুব সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাসূচক ভাষায়। আমার

রাহ্‌বর বারম্বার ইসারা করিয়া আমাকে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেও আমি থামিলাম না দেখিয়া সে বেচারার মুখ একেবারে চুন হইয়া গেল। এই সময়ে এই অঞ্চলের মীর খাঁ নামে এক ডাকাতের কথা সুদূর বাংলা দেশের কাগজে পর্য্যন্ত বিঘোষিত হইতেছিল; গবর্মেণ্ট্ তাহাকে গেরেপ্তার করিতে না পারিয়া পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। আমার কেমন মনে হইল—এই লোকটাই যদি সেই মীর খাঁ হয়! আমি সেই মীর খাঁর যত কীর্ত্তিকাহিনী কাগজে পড়িয়াছিলাম বা এ দেশে আসিয়া লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম, তাহা হইতে প্রশংসাসূচক আখ্যায়িকাগুলি বাছিয়া বাছিয়া বলিতে লাগিলাম এবং মধ্যে মধ্যে এই ব্যাপারের নায়কের সদাশয়তা ও বীরত্বের তারিফ করিতে লাগিলাম।

"মীর খাঁ একটা রেজ্‌লা কমিনা ভবঘুরে!"—আমার পথের সাথী উদাসীন ভাবে বলিল।

আমি মনে মনে বলিলাম—"এ কথা কেবল বিনয় প্রকাশ, না সত্যভাষণ?" এই ব্যক্তি যে মীর খাঁ সে সম্বন্ধে আমার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। প্রত্যেক থানায় থানায়, রেল-ষ্টেশনে ষ্টেশনে মীর খাঁর যে ছবি টাঙাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার সহিত এ ব্যক্তির সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে—সেই চোখ মুখ, সেই দাড়ি, সেই পাগড়ী! সে ফেরারী আসামী হইলেও সে চেহারা ও পোশাক কিছুরই পরিবর্ত্তন করে নাই—এমনি সে বে-পরোয়া!

সর্ব্বনাশের নেশা

সন্ধ্যার সময় আমরা একটা চটিতে আসিয়া পৌঁছিলাম। মীর খাঁ যাহা বলিয়াছিল তাহা দেখিলাম সত্য—এ স্থান ভদ্র-লোকের বাস করিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। একটা চেটাই-ঘেরা বেড়ার উপর শুকন চাম্‌ড়ার ছাউনি; পাছে দরমার বেড়া বাতাসে উড়িয়া যায় এজন্য কয়েকটা খোঁটার সঙ্গে দড়ির টানা দিয়া তাঁবুর মতন বাঁধা আছে। সেই একটি ঘেরের মধ্যেই মোটা কম্বলের পর্দ্দা টাঙাইয়া কাম্‌রা ভাগ হইয়াছে দুটি—একটিতে থাকে সরাইওয়ালী এক বুড়ী ও তাহার এক কিশোরী নাৎনী, সেই ঘরেই রাহ্‌গীর মুসাফিরদের রন্ধনাদি হয়; এবং অপর ঘরটি আগন্তুক অতিথি মেহ্‌মানদিগের বৈঠকখানা ও শয়নগৃহ খ্বাবগাহ্‌! ঘরের ভিতর ঢুকিয়া দেখি গোয়াল-ঘরে সাঁজাল দেওয়ার মতন ধোঁয়ায় ঘরটি ভরা; ধোঁয়া বাহির হইবার জন্য চামড়ার ছাদে ছিদ্রের অভাব নাই, কিন্তু বাহিরে হিমের চাপে ধোঁয়া আর ঠেলিয়া বাহির হইবার পথ পাইতেছে না। এই কুঁড়ের কুড়ি কদম দূরে আর-একটা চালা ছিল, সেটা রাহ্‌বান্‌-দিগের ঘোড়াদিগের আশ্রয় আস্তাবল! সুতরাং তাহার অবস্থা বর্ণনা না করাই ভালো।

আমরা যখন এখানে আশ্রয় লইলাম তখন এই চটিতে আর কোনো পথিক ছিল না। আমাদেব সৌভাগ্য!

সরাইওয়ালী বুড়ী আমার পথের সাথীকে দেখিয়াই কতক আহ্লাদে কতক বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—আয়্‌ বাবা মীর খাঁ!

মীর খাঁ ভ্রূকুটি করিয়া হাত তুলিয়া হুকুমের ভঙ্গীতে চুপ

করিতে ইঙ্গিত করিল। মীর খাঁর সেই হাত যেন বুড়ীর মুখ চাপিয়া ধরিল—এমনি হঠাৎ সে স্তব্ধ হইয়া থামিয়া গেল।

আমার রাহ্‌বর বা পথপ্রদর্শক আমার দিকে তাকাইয়া এমন মুখভাব করিল যেন সে বলিতে চায়—আমি এতবার বলিলাম তুমি ইঙ্গিত বুঝিলে না, এখন স্পষ্ট কথায় ব্যাপারটা বুঝিলে ত?

আমি মীর খাঁর অজ্ঞাতসারে রাহ্‌বরকে ইসারা করিয়া জানাইয়া দিলাম যে যাহার সঙ্গে রাত্রিবাস করিতে হইবে তাহার পরিচয় আমি অনেক আগে নিজেই আন্দাজ করিয়া লইয়াছিলাম।

মীর খাঁ বৃদ্ধাকে বলিল—মামা, তিন আদ্‌মীর লায়েক খানা বানাও। আমরা বহুত ভুখা হইয়াছি এই বুঝিয়া পরিমাণ স্থির করিবে।

এই কদর্য্য শূওরের খোঁয়াড়ে রাত্রির আহারটা নেহাৎ মন্দ হইল না,—মোটা রোটী, দুম্বা-ভেড়ার গোশ্‌ৎ, কাবাব, ফির্নি পোলাও, খাগিনা বা ডিম-ভাজা, আর মেওয়া—পেস্তা বাদাম আখ্‌রোট্‌ কিশ্‌মিশ্‌ সেব ও অতি সুমিষ্ট সর্দ্দা ও তর্‌মুজ! একটা কম্বল পাতিয়া মেঝেয় বসিয়া প্রচুর আহার পরিতোষের সহিত করা গেল।

আহারান্তে আচমন করিয়া আবার সেই কম্বলে আসিয়া বসিলাম। কিশোরী ও বৃদ্ধা আমাদের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিতেছিল। আমি তাহাদের দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছিলাম—

ইহারা হয়ত আমাদের আর্য্যা পিতামহী গান্ধারীর পিতৃবংশের কেহ হইবে।

ঘরের এক কোণে একটা খঞ্জনী টাঙানো ছিল। তাহা দেখিয়া আমি কিশোরীকে বলিলাম—মামক, তুমি গান করিতে পার?

এদেশে বৃদ্ধাদের সাধারণ ডাক-নাম মামা অর্থাৎ মাতা এবং বালিকাদের ডাক-নাম মামক অর্থাৎ ছোট মা বা ছোট বুড়ী।

মামক নিজে গান করিতে পারে কি না তাহার কোনো জবাব না দিয়া একটু ইতস্তত করিয়া ভয়ে ভয়ে মীর খাঁর দিকে চাহিতে চাহিতে বলিল—খাঁ-সাহেব খুব উম্‌দা গান করিতে পারেন।

আমি খাঁ-সাহেবকে বলিলাম—আপনি মেহেরবানী করিয়া একটা গান গাহিবেন? আমি আপনাদের গান শুনিতে পাইলে খুশী হইব।

মীর খাঁ বলিল—এমন ভদ্র দোস্তের অনুরোধ আমি অবহেলা করিতে পারি না। আমি আপনার খাসা খানা ও তাম্বাকু খাইয়াছি, তাহার বদলে আমার কর্কশ কণ্ঠের গান শুনাইব সে আর বেশী কথা কি?

মামক খঞ্জনী পাড়িয়া দিল। মীর খাঁ গাহিতে আরম্ভ করিল:—

আঁ ইয়ার্ কজ্-উ খান্-ই-মা জা-ই-পরী বুদ্,
সর্ তা কদমশ চুঁ পরী আজ আয়েব বরি বুদ্!

ঐ যে প্রিয়া যাহার বাসে আবাস আমার পরীস্থান,
শির থেকে তার চরণকমল পরীর মতন নিখুঁত-ঠাম !

মীর খাঁর কণ্ঠস্বর চড়া, একটু কর্কশ, কিন্তু অসহ্য নয় ; গানের সুর কেমন বুনো বিষণ্ণ ; কথাগুলি খাঁটি ফার্শী—হাফিজের পত্নীর মরণে শোকগাথা।

আমি গান শুনিয়া বলিলাম—এ ত ফার্সী গান। আমি আপনাদের দেশী গান শুনিতে চাহিয়াছিলাম।

মীর খাঁ এবার যাহা গাহিল তাহার এক বর্ণও বুঝিতে পারিলাম না। শুনিয়াছিলাম মীর খাঁ বেলুচী ব্রাহুই। তাহার গানের কথা ও মানে আমি লিখিয়া লইলাম, অনুবাদের ওস্তাদ সত্যেন্দ্র কবিকে উপহার দিব বলিয়া। বেলুচী কবির গানের কথা বাঙালী কবির কলমে যে রূপান্তর পাইয়াছিল তাহারই কিয়দংশ এখানে পাঠকপাঠিকাদিগকে উপহার দিতেছি—

"তাজা ঘাসে ভরা ক্ষেত্রের চেয়ে নধর সে কচি মুখ,
তুম্বা-মেষের পুচ্ছ জিনিয়া রসে ডগমগ বুক !
শীর্ণবৃন্ত কুসুমের মত বায়ুভরে দোলে কায়,
নাগকেশরের পেলব সুষমা সকল অঙ্গে ছায় !
আমি ভাবি মনে—বুঝি তার সনে মিলিব দিনের শেষে,
চির-আলোকিত পরীর রাজ্যে,—শত উৎসের দেশে !"

মীর খাঁ যখন আমাকে গানটির মানে বুঝাইয়া দিল তখন এই পার্ব্বত্য দেশের কবির অসাধারণ কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। আমি বলিলাম—চমৎকার! আজব! বহুৎ মিঠ্! ইহা কোন্ ভাষা? বেলুচী ভাষা?

মীর খাঁ গম্ভীর হইয়া কেবল বলিল—"হাঁ।" সে খঞ্জনী মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া প্রদীপের শিখার দিকে ম্লান বিষণ্ণ-দৃষ্টিতে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিল। প্রদীপের ক্ষীণ আলোতে তাহার মুখ ভয়ঙ্কর অথচ মহত্ত্বব্যঞ্জক দেখাইতেছিল—নরকাগ্নির সম্মুখে শয়তানের যে বর্ণনা মিল্‌টন করিয়াছেন, তাহা মনে পড়িয়া গেল। সেই শয়তানের মতন আমার দোস্তও বোধ হয় তাহার কোনো ভ্রষ্ট স্বর্গের কথাই ভাবিতেছিল যেখান থেকে তাহার দ্রোহিতার পাপ তাহাকে নির্ব্বাসিত বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে। সে দুটি গান করিল, দুটি গানেই পরীর মতন সুন্দরী কোন্ প্রেয়সীর বন্দনা করিল। তাহারই বিরহ বোধ হয় এই বীর দস্যুকে কাতর করিয়া তুলিয়াছে।

আমি মীর খাঁকে কথা কহাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম, যদি তাহার কোনো খবর বাহির করিয়া লইতে পারি। কিন্তু সে হাঁ না বলিয়াই আমার কথার জবাব দিতে লাগিল, তাহার গল্প করিবার প্রবৃত্তি যেন তিরোহিত হইয়াছিল; সে তাহার দুঃখময় চিন্তায় যেন ডুবিয়া গিয়াছিল।

রাত হইয়াছিল। মামা ও মামক দুইজনেই পর্দ্দার আড়ালে পাশের ঘরে শুইতে গিয়াছিল। আমরাও শুইব শুইব মনে

ঘোড়ার আস্তাবলে রাহ্‌বর

করিতেছি। আমার পথপ্রদর্শক রাহ্‌বর আমাকে ভয়ে ভয়ে বলিল—সাহেব, একবার আস্তাবলে চলুন।

এই কথায় মীর খাঁ যেন চম্‌কাইয়া ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিল এবং কর্কশ রূঢ় দৃঢ় স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় যাবে ?

রাহ্‌বর একেবারে এতটুকু হইয়া কষ্টে বলিল—আজ্ঞে, আস্তাবলে।

মীর খাঁ তেমনি ভাবে বলিল—কেন ? ঘোড়াদের দানা পানী ঘাস ত প্রচুর দেওয়া হইয়াছে। তুমি এইখানেই শোও—সাহেব কোনো আপত্তি করিবেন না।

রাহ্‌বর আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল— সাহেবের ঘোড়াটার বোধহয় বেমার হইয়াছে। বিদেশে বেগানা মুলুকে ঘোড়া অপটু হইয়া পড়িলে মুস্কিল হইবে। সময় থাকিতে কিছু ব্যবস্থা করা উচিত।

আমি স্পষ্টই বুঝিলাম যে রাহ্‌বর আমাকে গোপনে কিছু কথা বলিতে চায়। কিন্তু মীর খাঁর সন্দেহ উদ্রেক করা সুবুদ্ধির কাজ হইবে না বিবেচনা করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করাই কর্ত্তব্য স্থির করিলাম। তাই আমি রাহ্‌বরকে বলিলাম—আমি সলুত্রী (শালিহোত্র) নহি, অশ্বচিকিৎসায় আমার অভিজ্ঞতা কিছুমাত্র নাই ; অধিকন্তু আমার ঘুম পাইয়াছে। যাহা হয় কাল সকালে দেখা যাইবে।

মীর খাঁ বলিল—চলো আমি দেখিতেছি।

মীর খাঁ রাহ্‌বরকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া গেল এবং একটু

পরেই একলা ফিরিয়া আসিল। সে আমাকে বলিল—ঘোড়ার কিছুই হয় নাই। ঘোড়ার প্রতি অতিরিক্ত মমতা বশতঃ আপনার রাহ্‌বর ঘোড়ার পীড়া আশঙ্কা করিয়া নিজের পাগ্‌ড়ী দিয়া উহার গা ডলিয়া ডলিয়া উহাকে ঘামাইয়া তুলিয়াছে, এবং সারা রাত সে এমনি ভাবে দলাই-মলাই করিতেই থাকিবে ইচ্ছা করিয়াছে।

আমি বুঝিলাম মীর খাঁ রাহ্‌বরকে শাসন করিয়া আসিয়াছে, সে আর আমাকে কিছু বলিবার জন্য এই ঘরের ত্রিসীমানায় আসিতে সাহস করিবে না। আমি কম্বলের বিছানায় একখানা কম্বল ঢাকা দিয়া শুইয়া পড়িলাম; কিন্তু আমার বড় ওভার-কোটটাতে সর্ব্বাঙ্গ জড়াইয়া ঠিক যেন পাটিসাপ্‌টা হইয়া রহিলাম—যেন কোনোখানে এই সরাইএর শতেক কাবুলির শয়ন-কলুষিত অঙ্গ-বাসিত ময়লা কম্বলের সঙ্গে আমার অঙ্গের সংস্পর্শ না ঘটে।

মীর খাঁ আমার খুব কাছেই দরজা জুড়িয়া আড়াআড়ি ভাবে বিছানা পাতিতে পাতিতে বলিল—মাফ ফরমায়েস করিবেন, আপনার কাছ ঘেঁসিয়া শুইবার গুস্তাকী মাফ করিবেন।

ঘরের মধ্যে এত জায়গা থাকিতেও সে যে আমার বিছানা ঘেঁসিয়া দরজা জুড়িয়া শুইয়া গুস্তাকী কেন করিতেছে তাহার কোনো কারণ প্রকাশ না করিলেও আমি বুঝিলাম—আমার সঙ্গে রাহ্‌বরের মিলনের পথে বাধা দিবার উদ্দেশ্যেই তাহার এই আচরণ।

বিছানা পাতিয়া মীর খাঁ বন্দুকটা পরীক্ষা করিয়া দেখিল যে দুই নালই ভরা আছে কি না, এবং তাহার পর পুরাতন ক্যাপ খুলিয়া লইয়া নূতন দুটি ক্যাপ পরাইল ও ঘোড়া দুটা আস্তে আস্তে ক্যাপের উপর চাপা দিয়া বন্দুকটা তাহার বালিশের কোলে একেবারে ঘাড়ের তলে রাখিয়া দিল। পাঁচ মিনিট পরে সে নিদ্রাজড়িত স্বরে আমাকে ভগবানের হাতে সমর্পণ করিয়া রাতের মতন বিদায় চাহিল—"শব্-ই-শুমা ব-খয়ের!" আমিও তাহাকে বলিলাম—"আল্-হম্‌দ্-উলেল্লা!" এবং দুজনেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

আমি মনে করিয়াছিলাম আমি যে-রকম নিদ্রাসিদ্ধ ও যে-রকম ক্লান্ত হইয়াছি তাহাতে এই নোংরা ছেঁড়া দুর্গন্ধ কম্বলের বিছানাতেও এক ঘুমেই রাত কাবার করিয়া দিতে পারিব। কিন্তু সর্ব্বাঙ্গে কিসের কামড়ের অস্বস্তিকর চুল্‌কানিতে ঘণ্টা খানেক পরেই আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। কিটিংস্ পাউডারের বিজ্ঞাপনে মাত্র পড়িয়াছিলাম পিশুর নাম; আজ সেই সুবিখ্যাত জীবের সঙ্গে আন্তরিক ও চাক্ষুষ পরিচয় হইল,—মশা এবং ছারপোকাও প্রচুর! আমার ঘুম ভাঙার কারণ বুঝিতে পারিয়াই আমি বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলাম এবং বদ্ধ ঘরের মধ্যে মশা পিশু ও ছারপোকার শিকার হওয়ার চেয়ে খোলা জায়গায় রাত কাটানো শ্রেয় স্থির করিলাম। আমি আমার ওভারকোট ও রাগ্ গায়ে জড়াইয়া বেশ করিয়া গুটাইয়া লইয়া মীর খাঁকে ডিঙাইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া

গেলাম; সে গভীর নিদ্রায় অচেতন ছিল, কিছুই টের পাইল না।

দরজার বাহিরে একখানা কাঠের বেঞ্চ্ ছিল; আমি তাহারই উপরে শুইয়া পড়িলাম এবং আর-একবার ঘুমাইবার চেষ্টায় চোখ বুজিতে যাইতেছি, মনে হইল একটা লোকের ও একটা ঘোড়ার ছায়া নিঃশব্দে আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছে—যেন মানুষভূত ও ঘোড়াভূত ছায়াশরীরে নিঃশব্দে বিচরণ করিতেছে!

মানুষের ছায়াটা যেন রাহ্‌বরের বলিয়া মনে হইল। এই গভীর রাত্রে তাহাকে ঘোড়া টহল করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া আমি লাফাইয়া উঠিলাম এবং তাহার নিকটে অগ্রসর হইলাম। সে আমাকে দেখিয়া দাঁড়াইল। আমি নিকটে গেলে সে চাপা স্বরে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিল—রাহ্‌জান্‌টা কোথায়?

আমি বলিলাম—ঘরে, ঘুমাইতেছে, মশা পিশু ছারপোকা তাহার ঘুমের কাছে হার মানিয়াছে। কিন্তু তুমি এত রাত্রে ঘোড়া টহলাইতেছ কেন?

রাহ্‌বর চকিত দৃষ্টিতে একবার ঘরের দিকে তাকাইয়া চাপা গলায় বলিল—খোদার কসম্, আস্তে কথা কও সাহেব! তুমি ত জানো না ঐ অবতারটি কে! ও মীর খাঁ—বেলুচিস্তান থেকে ওয়াজিরিস্তান পর্য্যন্ত ইংরেজ মুলুকের সীমায় সীমায় সারা কুহিস্তানে (পাহাড়িয়া দেশে) সে রাহাজানী করিয়া নামজাদা হইয়াছে। আমি সারা দিন তোমাকে কত ইসারা করিলাম,

কিন্তু তোমার মোটা বুদ্ধিতে তাহার একটারও অর্থবোধ হইল না।

আমি হাসিয়া বলিলাম—ডাকাতই হোক আর সাধুই হোক, তাহাতে আমার কি? সে আমার কিছু লুট করে নাই, লুট করিবার ইচ্ছাও তাহার নাই, আর লুট করিবার মতন লোভনীয় সামগ্রীও আমার সঙ্গে কিছু নাই।

রাহ্‌বর বলিল—কোনো লোভনীয় মাল্ যে তোমার সঙ্গে নাই তাহা আমাদের নসিবের জোর বলিতে হইবে; আরও নসিবের জোর বলিতে হইবে যে আমরা তাহার দেখা পাইয়াছি—উহার গেরেপ্তারীর জন্য পাঁচ হাজার রূপেয়া ইনাম ও বখ্‌শিশ্‌ কবুল করা আছে জানো? মাইল দুই দূরে মিলিটারী পুলিশের থানা আছে; ভোর না হইতে আমি কতকগুলি জবর্‌-দস্ত্‌ গোলান্দাজ সওয়ার এখানে আনিয়া হাজির করিব। ওর ঘোড়াটা আমি লইয়া যাইতাম—খুব তেজী আছে, কিন্তু সেটা এমনি বদ্‌মায়েস যে তাহার মালিক ছাড়া অপরকে কাছে ঘেঁসিতেও দেয় না।

আমি বলিলাম—এ কী শয়তানী তোমার! বেচারা তোমার কোন্ ক্ষতি করিয়াছে যে তুমি তাহাকে ধরাইয়া দিতে যাইতেছ?

সে বলিল—ক্ষতি করে নাই বলিয়াই ত ধরাইয়া দিতে যাইতে পারিতেছি—ডাকাতের ক্ষতি করা মানে ত প্রাণে মারা! অধিকন্তু ডাকাতটাকে ধরাইয়া দিলে আমার পাঁচ হাজার রূপেয়া নফা হইবে!

—কিন্তু ওই যে ডাকাত মীর খাঁ তাহা তুমি কেমন করিয়া জানিলে ?

—নিশ্চয় ওই যে তাহাতে আর কোনো সন্দেহ নাই। সে আমার সঙ্গে আস্তাবলে গিয়া আমাকে শাসাইয়া বলিল—"তুমি আমাকে চেন মনে হইতেছে। যদি তুমি সাহেবকে আমার পরিচয় জানাইয়া দাও তাহা হইলে তোমার টুঁটি ছিঁড়িয়া ফেলিব ইয়াদ রাখিও!" আপনি উহার কাছে থাকুন সাহেব, আপনার কোনো তরাস নাই, আর আপনি উহার কাছে থাকিলে ও কিছু সন্দেহও করিবে না।

আমরা কথা বলিতে বলিতে সরাই হইতে অনেক দূরে চলিয়া আসিয়াছিলাম। রাহ্‌বর নত হইয়া ঘোড়ার পায়ের কাছে কি করিতে লাগিল। দেখিলাম ঘোড়ার খুরের শব্দ রোধ করিবার জন্য সে নিজের পাগ্‌ড়ী ছিঁড়িয়া ঘোড়ার চার পায়ের তলায় কাপড়ের গদি বাঁধিয়া দিয়াছিল; এখন দূরে আসিয়াছে, সরাই হইতে ঘোড়ার খুরের শব্দ আর শোনা যাইবে না বলিয়া সে সেই গদিগুলি খুলিয়া ফেলিতেছে। আমি তাহার বুদ্ধির পরিচয়ে বিস্ময় সাম্‌লাইয়া কিছু বলিবার আগেই সে চক্ষের পলকে ঘোড়ার পিঠে উঠিয়া বসিল ও ঘোড়া ছুটাইয়া দিবার উপক্রম করিল। আমি তাহাকে নিরস্ত করিবার জন্য মিনতি করিলাম, ভয় দেখাইলাম, তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া রাখিতে চাহিলাম।

কাবুলী পাঠানকে ধরিয়া রাখিবার বল অজীর্ণরোগজীর্ণ

বাঙালী আমার ছিল না। সে অতি সহজে আমার হাত ছাড়াইয়া মিনতির স্বরেই বলিল—আমি গরীব আদ্‌মী সাহেব, এক থোকে পাঁচ হাজার রূপেয়ার লোভ আমি ছাড়িতে পারি না; আমি এই সারা মুলুকের ভয়ের কারণ দূর করিয়া বখ্‌শিশ উপার্জ্জন করিব—আমি ত কোনো মন্দ কাজ গুনাহ্‌গারী করিতে যাইতেছি না। আমার এখন ফিরিয়া যাওয়াও নিরাপদ নয়। আপনি সাবধান থাকিবেন!

পাজীটা ঘোড়া ছুটাইয়া পাহাড়ঘেরা গভীর অন্ধকারে হারাইয়া গেল।

আমি আমার রাহ্‌বরের আচরণে অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করিতে লাগিলাম, এবং ভয়ও কম হইল না। মীর খাঁ আমাকে সন্দেহ করিলে ত সর্ব্বনাশ! এক মুহূর্ত্তের চিন্তাতেই স্থির করিয়া ফেলিলাম আমার এখন কর্ত্তব্য কি।

আমি সরাইখানায় ফিরিয়া আসিলাম। মীর খাঁ তখনও গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন—বহুদিনের জাগরণ অনশন পর্য্যটন ও উদ্বেগের ক্লান্তিতে আজ বেচারা একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আমি তাহাকে ডাকিলাম—আঘা সাহেব, আঘা সাহেব! খাঁ সাহেব! খাঁ জী!

সাড়া নাই। ভয়ে ভয়ে গায়ে হাত দিয়া নাড়া দিলাম। তবু অসাড়। তখন দুই হাতে ধরিয়া তাহাকে টানিতে টানিতে জোরে ডাকিলাম—আঘা সাহেব! খাঁ সাহেব!

এইবার সে তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিয়াই যেখানে তাহার

বন্দুক ছিল সেখানে চিলের ছোঁ মারার মতন হাত দিল। আমি সাবধান হইয়া আগেই বন্দুক সেখান হইতে সরাইয়া রাখিয়াছিলাম। সে বন্দুক না পাইয়া যে ভীষণ ভ্রূকুটি করিয়া আমার দিকে চাহিয়া লাফাইয়া উঠিল তাহা আমি জীবনে কখনো ভুলিব না—সে মূর্ত্তি ও ভঙ্গী মনে করিলে এখনও আমার হৃৎকম্প হয়—বাঘ যেন তাহার শিকারের টুঁটি ছিঁড়িতে উদ্যত হইয়াছে।

আমি দু পা হটিয়া পিছাইয়া গিয়া ভয়জড়িত স্বরে বলিলাম —মাফ করিবেন খাঁ সাহেব, আপনার ঘুম ভাঙাইয়াছি। একটা ছোট্ট প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবার আছে—আধ ডজন গোলান্দাজ সওয়ার এখানে আসা আপনি পছন্দ করিবেন?

সে বাঘের মতন গর্জ্জন করিয়া উঠিল—এ কথা আপনাকে কে বলিল?

—উপদেশ যাহার কাছ থেকেই আসুক না কেন, ভালো হইলেই ত হইল।

—আপনার রাহ্‌বর আমার সঙ্গে প্রতারণা করিয়াছে। আচ্ছা, এর মজা সে টের পাইবে। সে হারামজাদ কোথায়?

—আমি ঠিক জানি না।

—তবে কে বলিল? মামা বোধ হয়।

আমাদের চেঁচামেচি গোলমালে মামার ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল, সে ভয়ে ভয়ে তাহার বলিকুঞ্চিত প্রকাণ্ড মুখখানা পর্দ্দার ফাঁকে রাখিয়া আমাদের দেখিতেছিল, ও কথা শুনিতেছিল। মীর খাঁর মুখে তাহার নাম উল্লেখ শুনিবা মাত্রই সেই মুখখানা

ভয়ে কদর্য্যতর হইয়া পর্দ্দার পাশে সরিয়া গেল। আমি তাহার ঘরের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম এবং মীর খাঁ ছিল সেদিকে পিছন ফিরিয়া—আমি মামাকে দেখিতে পাইলাম, কিন্তু মীর খাঁ পাইল না।

আমি বলিলাম—না, মামা আমাকে কিছু বলে নাই। কে বলিয়াছে শুনিবার জন্য বিলম্ব না করিয়া আমার কথা শুনুন—গোলান্দাজ সওয়ার হইতে আপনার যদি কোনো ভয়ের কারণ থাকে তবে আর সময় নষ্ট করিবেন না; আর যদি ভয়ের কোনো কারণ না থাকে তবে নিশ্চিন্ত হইয়া শুইয়া পড়ুন—আপনার ঘুম ভাঙাইয়াছি, আমাকে মাফ করিবেন।

—রাহ্‌বর! রাহ্‌নুমা!—প্রথমেই আমি তাহাকে সন্দেহ করিয়াছিলাম। তাহার সঙ্গে আমার বুঝাপড়া একদিন হইবে। এখন সাহেব তবে বিদায়—খোদা হাফিজ! আমার এই উপকার করার দরুন্ আল্লা আপনাকে পুরস্কার করিবেন। আপনি যেমন শুনিয়াছেন বা ধারণা করিয়াছেন আমি তেমন খারাপ লোক নই; আমার চরিত্রে এখনো এমন কিছু আছে যাহার জন্য সৎ সাহসী লোকে আমার সঙ্গে হম্‌দর্‌দী করিতে পারে। আমার এক আফ্‌শোষ রহিয়া যাইবে যে আমি আপনার কাছে চিরঋণী হইয়াই থাকিব, ঋণ পরিশোধের কোনো উপায়ই পাইব না। খোদা হাফিজ, সাহেব, খোদা হাফিজ!

আমি তাহার কথায় ব্যথিত হইয়া বলিলাম—খাঁ সাহেব, আমার ঋণ তাহা হইলেই শোধ করা হইবে যদি আপনি

কাহাকেও সন্দেহ করিয়া কাহারো কোনো অনিষ্ট না করেন, প্রতিহিংসা মনে পোষণ করিবেন না। আপনার পাথেয় এই নিন কিছু চুরুট ও কিছু টাকা—খোদা হাফিজ।

আমি চুরুট ও টাকা সুদ্ধ হাত তাহার দিকে বাড়াইয়া দিলাম। সে মাত্র একটি চুরুট তুলিয়া লইয়া সেলাম করিল এবং নীরবে আমার হাত দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া বিদায় লইল। তার পর তাহার ব্যাগটা গলায় ঝুলাইয়া বন্দুকটা তুলিয়া লইয়া বৃদ্ধাকে কি দু চার কথা বলিল তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। সে তাড়াতড়ি আস্তাবলের দিকে চলিয়া গেল এবং কয়েক মিনিট পরেই শুনিলাম তাহার ঘোড়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পাহাড় প্রতিধ্বনিত করিয়া দূর দূরান্তে চলিয়া যাইতেছে।

আমি সরাইয়ের বাহিরে বেঞ্চে গিয়া বসিলাম, কিন্তু আর ঘুম আসিতেছিল না। আমি নিজেকে প্রশ্ন করিতে লাগিলাম—ডাকাতকে রক্ষা করা আমার ন্যায়সঙ্গত কার্য্য হইল কি? কত লোককে সে লুণ্ঠন করিয়া সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে, কত লোকের প্রাণ নষ্ট করিয়াছে, তাহাকে দণ্ডের হস্ত হইতে অপসারিত করিয়া সুকর্ম্ম করিলাম কি? হয়ত আমার রাহ্‌বর আইনের সহায়তা করিতে গিয়া আমার জন্য বিপন্ন হইল। সে লোকটা হতাশ হইয়া হয়ত আমারই উপর প্রতিহিংসা লইবে। এবং পরে যত ডাকাতি খুনখারাপী হইবে তাহার জন্য দায়ী হইব আমি, পাপ হইবে আমার! কিন্তু বিপন্নকে উদ্ধার না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কি মনুষ্যত্ব? এই যে মানুষের দয়াপ্রবণতা,

এ কি সব সময় যুক্তিতর্ক মানিয়া পাঁজিপুঁথি দেখিয়া কাজ করে ?

এইরূপ প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া দ্বিধায় দোদুল্যমান চিত্তকে যখন স্থির করিয়া আনিতেছিলাম, দেখিলাম রাহ্‌বর ছয় জন সওয়ার লইয়া সন্তর্পণে সরাই ঘেরাও করিয়া দাঁড়াইয়াছে, সে নিজে সকলের পিছনে দূরে আছে। আমি উঠিয়া তাহাদের নিকটে গেলাম, এবং তাহাদিগকে খবর দিলাম যে মীর খাঁ দু ঘণ্টা হইল প্রস্থান করিয়াছে।

ফৌজদার মামাকে ডাকাতের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল সে কিছুই জানে না। ফৌজদারের জেরায় সে বলিল—সে মীর খাঁকে চেনে বটে ; কিন্তু অবলা সে, একলা থাকে, সেইজন্য ভয়ে সে তাহার গতিবিধির কোনো খবর ফৌজদার সাহেবকে দিতে পারে না। মীর খাঁ মাঝে মাঝে তাহার সরাইয়ে আসিয়া আশ্রয় লয় এবং মাঝরাত্রেই সে চলিয়া যায়।

আমাকে জেরায় জেরবার করিতে করিতে ফৌজদার থানায় লইয়া গেল এবং আমার সঙ্গে মীর খাঁর যোগ-সাজুশের কোনো প্রমাণ না পাইয়া আমাকে ছাড়িয়া দিল। কিন্তু রাহ্‌বরের মন আমার প্রতি অপ্রসন্ন বিরূপ হইয়াই রহিল—আমিই যে তাহাকে রোক পাঁচ হাজার টাকা হইতে বঞ্চিত করিয়াছি সে সম্বন্ধে তাহার দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছিল। যাহাই হোক, আমি তাহাকে বিদায় দিবার সময় আমার সাধ্যমত পুরস্কার দিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া দিয়াছিলাম।

— ২ —

আমি কাবুল দেখিতে যাইব বলিয়া একদল সিন্ধী ও পেশোয়ারী বণিকের কাফেলার সঙ্গে জুটিয়া গেলাম। খাইবার-পাস্ পার হইয়া আফ্‌গানিস্তানের সীমান্তে খাইবার-পাসের ঘাটি ডাক্কা শহরে পৌঁছিলাম। কিন্তু আমাকে কাবুলীরা ইংরেজের গুপ্তচর মনে করিয়া কাবুলে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিল না। আমাকে ডাক্কা হইতেই আবার জমরুদে ফিরিতে হইবে। ভারত ও আফগানিস্তান দুরারোহ দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত-প্রাচীর দ্বারা পৃথক্কৃত, কেবল খাইবার-পাস্ নামে দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়া একটা শুঁড়ি পথ উভয় দেশে যাতায়াতের একমাত্র সহজ উপায়; এই শুঁড়ি পথের দুই মুখে দুই শহর—ভারত-প্রান্তে জমরুদ্ ও আফগানিস্তান-প্রান্তে ডাক্কা কেল্লা কামান সাজাইয়া ঘাটি আগ্‌লাইয়া আছে। এই পথ দিয়াই গ্রীকেরা ভারতে আসিয়াছিল, মুসলমান বিজেতারা আসিয়াছিল, মগ ও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরা আসিয়াছিল; এই পথ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। প্রত্যেক বৎসর লক্ষাধিক বণিক্ বিবিধ পণ্যসম্ভারে বোঝাই করা হাজার হাজার উট ঘোড়া খচ্চর লইয়া এই পথে যাতায়াত করে; বাংলায় বসিয়া যে মেওয়া আমরা খাই তাহা এই পথে আসে। কত ইরাণী তুরাণী এই পথে ভারতে আসিয়াছে। এই ভারত-প্রবেশের প্রসিদ্ধ একমাত্র সিংহদ্বার সপ্তাহে দুই দিন—মঙ্গল ও শুক্রবার—উন্মুক্ত থাকে; কিন্তু গ্রীষ্মকালে তাহাও এক শুক্রবার

জমরুদ্ কেল্লা

ছাড়া অন্য দিন খোলা থাকে না। যে-সকল লোক আফ্গানিস্তানে প্রবেশ করে ও তথা হইতে প্রত্যাগমন করে, আফগান্ রাজকর্ম্মচারীগণ তাহাদিগকে বিশেষ পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করিয়া ছাড়পত্র ও রাহ্দারী দেন। আমি ছাড়পত্র পাইলাম না—আমি বণিক্ নহি, তবে শুধু শুধু কাবুলে যাইবার উদ্দেশ্য খারাপ, আমার কিছু বদ্মৎলব নিশ্চয়ই আছে, এই সন্দেহে। গ্রীষ্মকাল। শুক্রবার ডাক্কায় পৌঁছিয়াছি। ফিরিবার জন্য আগামী শুক্রবার পর্য্যন্ত ডাক্কা শহরেই আমাকে অপেক্ষা করিতে হইবে। হিন্দুকুশ পর্ব্বতের পাদমূলে কাবুল-নদীর তীরে এই শহর।

একদিন সন্ধ্যাবেলা আমি কাবুল-নদীর তীরে এক পাথরের উপর বসিয়া এই পার্ব্বত্য দেশের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছিলাম; যুগ-যুগান্তরের ইতিহাস আমার মনের মধ্যে ভিড় করিয়া জাগিয়া উঠিতেছিল। এই কাবুল-নদী বৈদিক আর্য্য অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহদের নিকট কুভা-নামে পরিচিত ছিল; ইহারই নিকটের এই হিন্দুকুশ হয়ত তাঁহাদের সোমজনক মূজবান্ পর্ব্বত! ইহার তীরে কত সোম অভিষুত হইয়াছে, কত সোমযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আজ তাঁহাদের সভ্যতার ধারা এদেশ হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এখন এখানে সুদূর আরবের সভ্যতার ধারা অসভ্য বর্ব্বরতার সহিত সংমিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

হঠাৎ দেখিলাম নদীগর্ভ হইতে একটি তরুণী রমণী ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়া দেবী

গান্ধারীকে মনে পড়িল, পার্ব্বতী উমা হৈমবতীকে মনে পড়িল! রমণীর পরণে শুভ্র বস্ত্রের পেশোয়াজ, চুনারী কাপড়ের ঘাঘরা, লম্বা আস্তিনের ঢোলা কুর্ত্তা, মাথায় জরিদার ফিরোজা রঙের ওড়নার ঘোম্‌টায় মুখ ঢাকা, পায়ে তাহার জরিদার চাপ্‌লি জুতা। তরুণী আসিয়া একেবারে আমার পাশে আর-একখানা পাথরের উপর বসিল ও ঘোম্‌টা খুলিয়া ওড়না ঘাড়ের পিছনে পিঠের উপর ঝুলাইয়া দিল। দেখিলাম সে তরুণী সুন্দরী সুঠাম ও তাহার চোখ তুটি বড় বড় টানা টানা দীর্ঘ কৃষ্ণ পক্ষ্মজালে আচ্ছন্ন। তাহার মাথার চুল ঘন কৃষ্ণ, মাথার মাঝখানে সিঁথি কাটা, কালো রেশমীসূত্রে জরির কাজ করা জাদ দিয়া বেণী বাঁধা, মস্তকের উভয় পার্শ্বে কানের উপরকার জুল্‌ফি কুঞ্চিত ঝালর-কাটা—বিবাহিতা রমণীর চিহ্ন। তাহার বেণীতে একগুচ্ছ হেনার মঞ্জরী গোঁজা—তাহা হইতে তীব্র সুগন্ধ সেখানকার বাতাসকে যেন মথিত করিয়া তুলিতেছে; তাহার তুই জুল্‌ফিতে ফাঁস-বাঁধা পাতা-সুদ্ধ তুই গুচ্ছ আনার-কলি—বেদানা ডালিমের লাল টুকটুকে পেলব-পল্লব ফুল সরু সরু সবুজ পাতার ঝালরের মধ্যে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল।

পর-পুরুষের সম্মুখে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করা আফ্‌গান রমণীদের রীতি নয়; তবে যাযাবর জাতিরা এই আবরু রক্ষা করিতে পারে না বলিয়াই এ প্রথা তাহারা পালন করে না। এই সুন্দরী হয় যাযাবর জাতির, নয় ত ভালো লোক নয়। কিন্তু, তাহার জুল্‌ফি ঝালরকাটা—সে বিবাহিত। সে যেই হোক, একে মহিলা তায় সুন্দরী তরুণী, আমি তাহাকে খাতির করিয়া

আমার মুখের চুরুটটা ফেলিয়া দিয়া তটস্থ হইয়া ভব্য ভাবে বলিলাম—সেলাম আলেকম, খানুম!

তরুণী রূপসী রূপার পাত্রে ঝর্ণাঝরার শব্দ করিয়া বলিল—আলেকম সেলাম সাহেব। আপনি অমন সুন্দর চুরুটটা ফেলিয়া দিলেন কেন? আমি তাম্বাকুর খুশ্‌বু পসন্দ্‌ করি—আমি তাম্বাকু পিয়া থাকি।

আমি তাড়াতাড়ি একটা খুব নরম সিগারেট বাছিয়া বাহির করিয়া তাহাকে দিলাম, এবং দেশলাই জ্বালিয়া দুই হাতের খোলের মধ্যে শিখাটিকে জলো হাওয়ার আক্রমণ হইতে বাঁচাইয়া সুন্দরীর মুখের কাছে ধরিলাম; পার্ব্বতী তাহার মুখখানি আমার দিকে ঝুঁকাইয়া শিখাতে চুরুট ধরাইতে লাগিল; দেশলাইএর শিখার আলোতে তাহার মুখখানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল এবং ক্ষণে ক্ষণে চুরুটের টানে টানে শিখা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়া তাহার মুখের উপর ক্ষণপ্রভার খেলা ফুটাইয়া তুলিতে লাগিল। আমি সেই আলোকে অতি নিকটে তাহার মুখখানি ভালো করিয়া দেখিয়া লইলাম—তাহার ললাটতট যেন একাদশীর খণ্ডশশী, তাহার নাকটি যেন হাতীর দাঁতের তৈরী বাঁশী, তাহার চোখদুটি যেন স্বচ্ছসলিল সরোবর, তাহার ঠোঁট দুখানি যেন খোসা-ছাড়ানো কাগজী বাদাম, তাহার দাঁতগুলি যেন কুন্দফুলের মালা, তাহার জুল্‌ফির ফাঁশে ঝোলানো ডালিমফুলের লালিমা-লাগা গাল দুটি যেন পাকা সেব, তাহার চিবুকটি যেন সফেদ-কোহ্‌ পাহাড়ের তুষারাচ্ছন্ন চূড়া, তাহার কান দুটি যেন মুক্তাজননী

শুক্তির দুখানি খোল, তাহার কণ্ঠ যেন শঙ্খ, তাহার আঙুলগুলি যেন কনকচাঁপার কলি,—তাহার সমস্ত মুখখানি যেন পল্লবদল-বেষ্টিত বড় একটি বসোরা গোলাপ !

আমরা পাশাপাশি দুই পাথরে বসিয়া; নীচে বক্র অসি-ধারার ন্যায় নদী, উপরে নক্ষত্রপুঞ্জ, আমাদের উভয়কে বেষ্টন করিয়া নক্ষত্রালোক-মিশ্র স্বচ্ছ তরল অন্ধকার—যেন একখানি জরির পোড়েন রেশমের টানা দিয়া বোনা পাতলা উত্তরীয় উভয়ে ভাগাভাগি করিয়া গায়ে দিয়া জগৎকে আড়াল করিয়া বসিয়া আছি। আমার প্রতিবাসিনীর সৌন্দর্য্য ও তারুণ্য আমি মনে প্রাণে অনুভব করিতেছিলাম।

তরুণী পার্ব্বতী চুরুটে ঘন ঘন পাঁচ সাত টান দিয়া চুরুটটা বেশ করিয়া ধরাইয়া লইয়া ঝর্ণা-ঝরার শব্দের মতন মধুরস্বরে বলিল—এখন কটা বাজিয়াছে ?

আমি আমার পকেট হইতে ঘড়ী বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে ধরিলাম—রেডিয়াম ডালার ঘড়ীর অঙ্ক ও কাঁটা জ্বলিতে-ছিল। তাহা দেখিয়া তরুণী বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া বলিয়া উঠিল—বাঃ! আজব! তাজ্জব! সাহেব-লোক হুনর ও কুদ্‌রতে বহুৎ বাহাদুর! আপনি ইংলিশ ?

আমি বলিলাম—আপনার বান্দা বাঙালী। আপনি আফ্‌গানী ?

তরুণী তাহার সুন্দর ছোট মাথাটি নাড়িয়া বলিল—না।

—তবে ওয়াজিরি ?

তরুণী [illegible] ঝর্ণার মত খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল—না।

—ব্রাহুই ?

আবার সেই হাসির পরে একটি ছোট্ট—না।

—আফ্রিদি ?

—না।

—তুরাণী ?

—না, না।

—তুর্কী ?

যুবতী কৌতুক অনুভব করিয়া বলিয়া উঠিল—না, না, না।

—তবে ইরাণী ?

যুবতী খুশী হইয়া বলিয়া উঠিল—বেশক্! বেশক্! আমি ইরাণী—বেদেনী—জাদুগরী—ডাইনী—ফাল্গীর (গণৎকার)। আপনি বেগানা পরদেশী, তাই আমাকে চেনেন না। এদেশের সবাই ফিরোজা ডাইনীকে চেনে—আমিই সেই ফিরোজা ডাইনী।

তাহার কথা শুনিয়া আমার হাসি পাইল। মনে মনে বলিলাম—মন্দ না! দুদিন আগে ডাকাতের সঙ্গে দোস্তী হইল, আজ ডাইনীর সঙ্গে আলাপ হইতেছে! স্বয়ং শয়তানের অনুচরদের সঙ্গে পরিচয়! দেশ ভ্রমণে বাহির হইলে কত রকমের অভিজ্ঞতাই না হয়! এই ফিরোজা ডাইনী বোধহয় বেদের সেইসব ঋষির কোনো একজনের বংশের কন্যা যাঁহারা

ঝাড়ফুঁক তুকতাক মন্ত্রতন্ত্র বশীকরণ উচাটন স্তম্ভন মারণ অভিচার ঔষধ জড়িবটী প্রয়োগ প্রভৃতির ব্যবস্থা প্রথম দিয়াছিলেন!

আমি চুপ করিয়া ভাবিতেছি দেখিয়া ফিরোজা আবার খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—ডাইনীকে দেখিয়া ডর মালুম হইতেছে?

আমি বলিলাম—না, তর্‌স্‌ নয়, সখ হইতেছে তোমাকে ভালো করিয়া জানিতে।

সে বলিয়া উঠিল—আমার বাড়ীতে যাইতে পারিবে?

তাহার এই হঠাৎ নিমন্ত্রণে আমি একটু বিব্রত হইয়া পড়িলাম—বাস্তবিক সে কেমন লোক তাহা জানি না, তাহার বাড়ীতে যাইতে সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল; কিন্তু এখনি বলিয়াছি যে আমি ভয় পাই নাই, তাহার সহিত যাইতে অস্বীকার করিলে তাহা ভয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। আমি সঙ্কোচ বা লজ্জায় একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম—কেন পারিব না? সুন্দরী শয়তানীর সঙ্গে জাহান্নমে যাইতেও আমার আপত্তি নাই। তুমি ত বেহেশ্‌তের হুরী! তুমি ফির্‌-দৌসের পরী!

ফিরোজা ফোয়ারার মতন হাসি ছড়াইয়া বলিয়া উঠিল—

"আগর্‌ ফিরদৌস্‌ বর্‌-রুয়ে জমীনস্ত্‌।
হমীনস্ত্‌ হমীনস্ত্‌ হমীনস্ত্‌॥"
স্বর্গ যদি ধরার বুকে থেকে থাকে কোন্‌স্থানে,—
এইখানে সে এইখানে গো এইখানে রে এইখানে!

সে আবার অন্ধকারের বুকে বিদ্যুৎ-ঝলকের মতন হাসি চল্‌কাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। আমিও মন্ত্রমুগ্ধ বশীভূতের মতন দাঁড়াইলাম। সে চলিতে আরম্ভ করিবার আগে আবার জানিতে চাহিল কটা বাজিয়াছে। আমি ঘড়ী বাহির করিয়া সময় দেখিলাম!

নির্জ্জন অন্ধকার নদীতীর ধরিয়া চলিয়াছি একেবারে পাশাপাশি বাঙালী আমি ও ইরাণী তরুণী ফিরোজা! একেবারে রোমান্স্ যাহাকে বলে।

আমরা শহরে আসিয়া পৌছিলাম। রাত্রি গভীর হইয়াছে, পথ নির্জ্জন, দোকানপাট প্রায় বন্ধ। ফিরোজা শহরের প্রান্তেই এক গলির মধ্যে একটা বাড়ীতে লইয়া গেল, একটা বুড়ী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। আমরা একটা বেশ বড় রকমের ঘরে প্রবেশ করিলাম। ফিরোজা বুড়ীকে আমার দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কি বলিতেই সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ঘরের মধ্যে আস্‌বাব বেশী কিছু নাই—একখানা চারপাই, দুটো মোড়া, একটা ফর্সী হুঁকা, একটা জলের কুঁজো, একটা ডালায় কতকগুলা সেব আঙূর ও পেঁয়াজ একত্র রহিয়াছে। চারপাইখানার উপর একটা গালিচা পাতা ও দুটা তাকিয়া বালিশ আছে, এবং মোড়া দুটার উপর দুখানা দুম্বা-ভেড়ার চাম্‌ড়া পাতা আছে।

ফিরোজা আমাকে একটা মোড়া দেখাইয়া বলিল—বস্‌তে আজ্ঞা হোক সাহেবের।

আমি বলিলাম—তুমি না বসিলে আমি বসি কেমন করিয়া।

ফিরোজা দম-ফুরানো লাট্টুর শেষ পাকের মতন বোঁ করিয়া একবার ঘুরিয়াই টাল খাইয়া টপ করিয়া একটা মোড়ায় বসিয়া পড়িল! আমি তাহার সম্মুখে অপর মোড়ায় বসিলাম।

ফিরোজা খাটের তলা হইতে একটা ঝাঁপি টানিয়া বাহির করিল এবং তাহা খুলিতে খুলিতে বলিল—আমি তোমার নসিব গণিব।

আমি হাসিয়া বলিলাম—তোমার গণিবার আবশ্যক নাই—আমি জানি যে আমার নসিব খুব ভালো। ভাগ্য সুপ্রসন্ন না হইলে অকস্মাৎ বেহশ্‌তের হুরীর সঙ্গে মুলাকাৎ হয়?

ফিরোজা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া ঝাঁপি হইতে বাহির করিল—একজোড়া ময়লা পুরাণো কোণ-ছেঁড়া তাস, পাশার পাষ্টির মতন চার পাশে ফোঁটা-কাটা একটা চৌকো গুটি, একটা চুম্বক পাথর, একটা মরা শুক্‌নো গিরগিটি, একখানা লম্বা হাড় ও একটা বানরের মাথার খুলি! এইসব দেখিয়া সর্ব্বাঙ্গ সিরসির ঘিনঘিন করিয়া উঠিল—একেবারে পূরাদস্তুর ডাইনী!

সে আমার বাঁ-হাতখানা টানিয়া লইয়া তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া হাতের রেখায় রেখায় আমার ভাগ্য-লেখা পাঠ করিতে করিতে যেন অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—সাহেব কটা বাজিয়াছে?

আমি আবার ঘড়ী বাহির করিয়া সময় বলিলাম।

ফিরোজা আবার সেইরকম অন্যমনস্কভাবেই জিজ্ঞাসা করিল—তোমার ঘড়ীটা কি সোনার?

আফ্‌গান মহিলার পোশাকে ফিরোজা

আফগান মহিলার পোশাকে ফিরোজ।

আমি বলিলাম—হাঁ।

সে আমার হাতের উপর ঝুঁকিয়া থাকিয়া হাতের রেখায় রেখায় আঙুল বুলাইতেছিল, বলিয়া উঠিল—তোমার নসিব বহুৎ উম্‌দা! তুমি জনানাদিগের জান্! তুমি জনানাদিগের দিল্‌দার দোস্ত্! তুমি দানিশ্‌মন্দ্, দৌলতমন্দ্, দরিয়া-দিল্!...

ফিরোজার এই স্তুতিবাদে আমি কৌতুক অনুভব করিতে-ছিলাম—আমাকে খুব ভালো বলিয়া খুশী করিয়া কিছু বড় রকম বখ্‌শিশ্ আদায় করিবার ফন্দি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াও আমি তাহার সুমিষ্ট কণ্ঠের মোহে অভিভূত হইয়া বসিয়া বসিয়া তাহাকে ভালো করিয়া দেখিতেছিলাম।—ইরাণীরা বলে কোনো রমণী সুন্দরী হইতে হইলে তাহার তিন তিন করিয়া দশটি—তিন দশে ত্রিশটি—সুলক্ষণ থাকা চাই—তাহার থাকিবে তিন কালো—কেশ ভ্রূ চোখ, তিন শুভ্র—রং দাঁত নখ, তিন ক্ষীণ—কোমর অধর অঙ্গুলি, তিন লাল—তিন স্থূল—ইত্যাদি। আমি এই তিনের লক্ষণ ফিরোজার অঙ্গে অঙ্গে মিলাইয়া দেখিতেছিলাম ও মনে মনে পরম কৌতুক অনুভব করিতেছিলাম। তাহার গায়ের রং গৌরবর্ণ হইলেও একটু রোদপোড়া, গায়ের গঠন নিটোল মসৃণ; তাহার চোখ দুটি তেরছা টানা সরু ফালি মতন—একেবারে যাহাকে বলে পটোল-চেরা। তাহার ঠোঁট দুখানি পাতলা, কচি কিশলয়ের মতন লাল কোমল, মৃদু মৃদু কম্পিত। তাহার দাঁতগুলি সুসজ্জিত শুভ্র। তাহার হাত দুখানি ছোট ছোট; আঙুলগুলি সরু সরু লম্বা, ডগার কাছে

উপর দিকে ঈষৎ উল্টানো। তাহার কেশ শ্যামা পাখীর পালকের মতন কুচ্‌কুচে অথচ চক্‌চকে কালো, দীর্ঘ কুঞ্চিত প্রচুর। তাহার রূপবর্ণনার খুঁটিনাটি দিয়া কথা না বাড়াইয়া এই বলিতে পারি—তাহার চেহারাখানি মোটের উপর সুন্দর; যা কিছু তাহার খুঁৎ আছে তাহা যেন বৈষম্যের তুলনায় তাহার সৌন্দর্য্যালক্ষণ অপর ঐশ্বর্য্যগুলিকে ফুটাইয়া সুস্পষ্ট করিয়া তুলিবার জন্যই। তাহার সৌন্দর্য্য যেন সাপের সৌন্দর্য্য, বাঘের সৌন্দর্য্য—রমণীয় ভয়ঙ্কর, অসামান্য অথচ বন্য বর্ব্বরতার হিংস্রতা-মাখা! সে সৌন্দর্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়, কখনো ভোলা যায় না; কিন্তু তাহা মনকে স্তম্ভিত করে, ভয়ার্ত্ত করে! তাহার সুন্দর চোখের দৃষ্টি লালসালুলিত অথচ ভয়ঙ্কর—কামার্ত্তা বাঘিনীর দৃষ্টির মতন! সে রকম দৃষ্টি আমি কখনো কোনো রমণীর—কোনো মানুষের—চোখে দেখি নাই। সে দৃষ্টি দেখিয়াছি আলিপুরের পশুশালায় কালো বাঘের চোখে, ক্রুদ্ধ বাংলা-বাঘের চোখে, আর ঘরের মধ্যে চড়াই পাখী আসিলে বাড়ীর পোষা বিড়ালের চোখে!

আমার হাত দেখিতে দেখিতে ফিরোজা হঠাৎ বানরের মাথাটা তুলিয়া ধরিয়া বিকট চ্যাক্‌ চ্যাক্‌ শব্দ করিতে করিতে আমার চোখের কাছে সেটা গুঁজিয়া দিতে গেল। আমি সেই আচম্‌কা আক্রমণে ভয়ে বিহ্বল হইয়া চোখ বুজিয়া পিছন দিকে চিতাইয়া পড়িলাম। পরক্ষণেই ফিরোজার হাসির খিল্‌খিলানিতে ঘর ভরিয়া উঠিল, আমি সোজা হইয়া বসিয়া

চোখ মেলিয়া দেখি ফিরোজা নূতন-পাক-খাওয়া লাট্টুর মতন ঘরময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া অপরূপ ছন্দে নাচিতে নাচিতে হাসিতেছে! তাহার এই ছেলেমানুষী খেলায় ও আমার অকারণ ভয় পাওয়াতে আমিও খুব হাসিতে লাগিলাম। ফিরোজার হাসির শব্দ অকস্মাৎ গানের সুরে রূপান্তরিত হইয়া গেল, আমি হাসি থামাইয়া মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলাম ফিরোজার গান—

বুল্‌বুল আজ্ গুল্ বগুজারদ্ গর্ দর্ চমন্ বিনদ্ মা-রা।
বুৎপরশ্তী ক্যয় কুনদ্ গর্ বর্‌হামন্ বিনদ্ মা-রা॥

বুলবুল ফুল ফেলি' ছুটে আসে
বাগানে ফুটিলে রূপ মোর,
প্রতিমা-পূজন ত্যজে ব্রাহ্মণ
হেরি' মোর রূপ চিত-চোর!

এই মধুর গান দুর্ভাগ্যক্রমে শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার অবসর পাইলাম না; ফিরোজা এই একটি কলি গাহিয়া পাল্টাইয়া গাহিতে যাইবে এমন সময় বাধা পড়িয়া গেল—হঠাৎ ঘরের বন্ধ দরজাটা কাহার রূঢ় ধাক্কায় ধড়াস করিয়া বুক ফাটিয়া দুফাঁক হইয়া দেয়ালের গায়ে গিয়া জোরে আছ্‌ড়াইয়া পড়িল এবং ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল একজন জোয়ান কাবুলী তাহার ঢিলাঢালা পোষাকের প্রাচুর্য্য ও বিষম ক্রোধের উগ্র ব্যস্ততা লইয়া। লোকটি মাথার কুল্লা টুপির গায়ে জড়ানো পাগ্‌ড়ীর পিঠের দিকের ঝুলন অংশটা ডাহিন কাঁধের উপর দিয়া সাম্‌নের দিকে আনিয়া মুখের উপর দিয়া লইয়া বাঁ কাঁধের উপর

ফেলিয়া দিয়াছিল, তাহাতে তাহার মুখের নীচের দিক্ দেখা যাইতেছিল না, কেবল দেখা যাইতেছিল জ্বলন্ত অঙ্গারের মতন দুটা ছোট ছোট চোখ এবং খড়্গের মতন একটা নাকের খানিকটা। সেই লোকটা ঘরে ঢুকিয়াই ফিরোজাকে কি বলিল, সে ভাষা আমি বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু এটুকু বুঝিলাম যে সে যাহা বলিল তাহা প্রণয়-সম্ভাষণ ত নহেই বরং তাহার উল্টা। আর বুঝিলাম—লোকটির মেজাজ কড়া, ভাষা কর্কশ, ভঙ্গী মার-মুখো। লোকটাকে এমন করিয়া হঠাৎ আসিয়া তাহাকে তিরস্কার ও ভৎর্সনা করিতে শুনিয়া ফিরোজা একটুও আশ্চর্য্য বা রাগের ভাব প্রকাশ করিল না, বরং সে অসমাপ্ত নৃত্যের ছন্দজড়িত দ্রুত-পদে তাহার নিকটে গিয়া যেন কথার ফোয়ারার মুখ খুলিয়া দিল—কথা যেন তুবড়ীবাজীর ফুলের মতন ফর্‌ফর্ করিয়া খই ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। তাহাদের কথার মধ্যে একটি কথা বারম্বার উচ্চারিত হইতেছিল—বেগানা—বেগানা—বেগানা! বুঝিলাম বিদেশী আমাকে লইয়াই উহাদের মধ্যে গোল লাগিয়াছে। এই একটি কথা বুঝিয়াই আমার বুকটা ধক্‌ধক্ ধক্‌ধক্ করিতেছিল—ক্রুদ্ধ যণ্ডা কাবুলীওয়ালার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে একজন তরুণীর ঘরে অনধিকারে আসার! এই পদে পদে বিপদ্‌সঙ্কুল দেশে আমার একমাত্র অস্ত্র সম্বল ছিল একটা মোটা ভারী ওক-কাঠের লাঠি—আমি সেটাকে বেশ করিয়া বাগাইয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া সেই আগন্তুক আততায়ীর মাথায় বসাইয়া অন্ধকারে সট্‌কান্ দিবার শুভ সুযোগের প্রতীক্ষা

করিতেছিলাম। লোকটা ফিরোজাকে রূঢ় ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া দৃঢ় পদক্ষেপে আমার দিকে দু পা আগাইয়া আসিয়াই হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল এবং এক পা পিছাইয়া গিয়া বলিয়া উঠিল—আ সাহেব, আপনি !

এবার তাহার মুখের ঢাকা সরিয়া যাওয়াতে আমিও তাহাকে চিনিলাম—সে ডাকাতের সর্দ্দার মীর খাঁ! তখন আমার বিষম আফশোষ হইল কেন আমি ডাকাতটাকে ফাঁশীর নিশ্চিত কবল হইতে বাঁচাইয়াছিলাম! সে ফাঁশীকাঠের বরণমাল্য গলায় পরিলে আজ ত এমন অসময়ে আসিয়া রসভঙ্গ করিতে ও আমার হৃৎকম্প ঘটাইতে পারিত না।

তাহার সম্ভাষণের প্রত্যুত্তরে বিরক্তি ও ভয় যথাসম্ভব গোপন করিয়া বলিলাম—আ দিলাবর গাজী, আপনি! বড় অসময়ে আসিয়া রসভঙ্গ করিলেন,—খানুম আমার নসিব গণনা করিয়া আমার পরম সৌভাগ্যের প্রমাণ স্বরূপ তাঁহার মধুর কণ্ঠের সুন্দর গান শুনাইয়া দিতেছিলেন।

মীর খাঁ দাঁতে দাঁত চাপিয়া ফিরোজার দিকে তীক্ষ্ণ বাণের মতন দৃষ্টি হানিয়া বলিল—শয়তানীর খেলা এইবার আমি শেষ করিব!

ফিরোজা তখনো ক্রমাগত বাক্যের ফোয়ারার মতন অনর্গল তাড়াতাড়ি বকিয়া যাইতেছিল এবং ক্রমে ক্রমে সে অধিকতর উত্তেজিত ও অধৈর্য্য হইয়া উঠিতেছিল। তাহার চোখে বিদ্যুৎ ঝলকিতেছিল, তাহার গণ্ডে রক্ত জমিয়া উঠিয়াছিল, তাহার

গলার শিরা স্ফীত হইয়াছিল, তাহার সুন্দর মুখ ক্রোধে কোথাও আকুঞ্চিত ও কোথাও বা বিস্ফারিত হইয়া কুশ্রী ভীষণ দেখাইতেছিল; সে থাকিয়া থাকিয়া কলহ-রত কুকুরের ন্যায় দাঁত খিঁচাইতেছিল, কখনো বা মাটিতে পা ঠুকিতেছিল, কখনো বা দুই হাত মুঠি করিয়া সম্মুখে তুলিয়া ঘন ঘন নাড়িতেছিল, তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া আমার অনুমান হইল সে মীর খাঁকে কিছু একটা করিতে জেদ করিতেছে, কিন্তু মীর খাঁ তাহার অনুরোধ পালনে ইতস্তত করিতেছে। সেই অনুরোধটি যে কি তাহা আর বুঝিতে বাকি থাকিল না যখন দেখিলাম ফিরোজা তাহার ক্ষুদ্র করতল নিজের গলার সাম্‌নে চিত করিয়া করতলের এক পাশ নিজের গলার উপর দিয়া দ্রুত ঘন ঘন চালনা করিয়া ছুরী দিয়া গলা কাটার ইঙ্গিত করিতে লাগিল। নিশ্চয়ই কাহারো গলা কাটিবার কথা হইতেছে এবং সেই গলাটা যে আমার সে সম্বন্ধেও আমার বিষম সন্দেহ ও আশঙ্কা হইতে লাগিল।

ফিরোজার এই বাক্যবন্যার উত্তরে মীর খাঁ তীব্র রূঢ় কর্কশ স্বরে অল্প কয়েকটা কথা বলিল। তখন ফিরোজা মীর খাঁর দিকে পরম তাচ্ছিল্য ও ঘৃণায় ভরা একটা দৃষ্টি হানিয়া ছিট্‌কাইয়া ঘরের দূর কোণে চলিয়া গেল এবং মাটিতে আসনপীঁড়ি হইয়া বসিয়া পড়িয়া ঝুড়ি হইতে একটা সেব তুলিয়া লইয়া খোসা সুদ্ধই পরম শান্ত নিশ্চিন্ত ভাবে কাম্‌ড়াইয়া কাম্‌ড়াইয়া খাইতে লাগিল—যেন ঘরের মধ্যে আর কেহ নাই, এতক্ষণ সে ক্রুদ্ধ হইয়া বকাবকি করে নাই।

মীর খাঁ আসিয়া আমার বাহু ধরিয়া আমাকে দরজার কাছে লইয়া আসিল এবং দরজা খুলিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল; নীরবে আমার হাত ধরিয়া সে কিছুদূরে আমাকে লইয়া গেল এবং এক সময় হঠাৎ আমার হাত ছাড়িয়া দিয়া পিছন ফিরিয়া দ্রুতপদে অন্ধকারে কোথায় মিলাইয়া গেল।

আমি ভেড়ার মতন বোকা বনিয়া আমার সরাইখানায় ফিরিয়া আসিলাম। ক্রোধে বিরক্তিতে মেজাজটা বিষম বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছিল—ক্রোধ ও বিরক্তি কতকটা নিজের আহাম্মকীতে এবং কতকটা ফিরোজা ও মীর খাঁর দুর্ব্বোধ্য অভদ্র আচরণে। এই বিরক্তিটা আরো বর্দ্ধিত হইল যখন জামা ছাড়িতে গিয়া দেখিলাম আমার সোনার চেন সুদ্ধ সোনার ঘড়ীটা বেমালুম অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে!

নানা কারণে কাবুলী পুলিসের কাছে চুরির নালিশ আর করিলাম না—নিজের আহাম্মকীর পরে পুলিসে খবর দেওয়া—বিশেষ করিয়া কাবুলী পুলিসের শরণাপন্ন হওয়া—অধিকতর আহাম্মকী হইবে বলিয়া মনে হইল। আমি কাবুলী কাণ্ডের উপর হাড়ে চটিয়া গিয়াছিলাম। যে সাত দিন বাধ্য হইয়া কাবুলী সীমানায় আবদ্ধ ছিলাম সে কয়দিন আর সরাই ছাড়িয়া বাহির হই নাই বলিলেও চলে।

আমি ডাক্কা হইতে জম্‌রুদে ফিরিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আমি পেশোয়ারে ফিরিয়া আসিতেই প্রভাসবাবু ও অন্যান্য অধ্যাপকেরা অসাধারণ উচ্ছ্বসিত আনন্দের সহিত

আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। আমি তাঁহাদের সৌজন্যে মুগ্ধ হইলেও তাঁহাদের আনন্দের আতিশয্যে বিস্মিত হইলাম।

প্রভাস-বাবু বলিলেন—আঃ মশায়, আপনাকে দেখিয়া বাঁচা গেল! আমরা ত আপনার আশা ছাড়িয়াই দিয়াছিলাম—ডাকাতে আপনার ঘড়ী কাড়িয়া লইয়াছে অথচ প্রাণে মারে নাই ইহা আমরা ভাবিতেই পারি নাই।

আমি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—আমার ঘড়ী চুরির খবর আপনারা কেমন করিয়া জানিলেন?

প্রভাস-বাবু হাসিয়া বলিলেন—আপনার আসার আগেই আপনার ঘড়ী এখানে আসিয়া পৌছিয়াছে; যে আপনার ঘড়ী চুরি করিয়াছিল সে হাজতে আছে! সে এমন হৃদয়হীন নিষ্ঠুর ডাকাত যে সে এক পয়সার জন্য একজন মানুষ খুন করিতেও পিছ-পা হয় না; তাহার কাছে আপনার ঘড়ী পাওয়া যাওয়াতে আমরা সবাই ভাবিয়াছিলাম সে নিশ্চয় আপনাকে মারিয়া ফেলিয়া ঘড়ী কাড়িয়া লইয়াছিল। আপনি ঘড়ীটা ফেরত পাইবেন—আপনাকে একবার থানায় গিয়া ঘড়ীটা সনাক্ত করিতে হইবে।

আমি বলিলাম—আমি ঘড়ীর দাবী ছাড়িয়া দিতে বরং রাজী আছি, কিন্তু বেচারার দণ্ড বৃদ্ধি করিতে আমি চাহি না।

ইস্‌লামিয়া কলেজের সাহেব প্রিন্সিপ্যাল হাসিয়া বলিলেন—প্রাণদণ্ড যাহার অবধারিত তাহার আর দণ্ডবৃদ্ধি কি হইবে। সে বদ্‌মায়েসটা এমন হিংস্র ভয়ঙ্কর যে তাহার প্রতি করুণা

প্রকাশ করা যায় না। মীর খাঁ ডাকাতের মাথার মূল্য পাঁচ হাজার টাকা! সে কি শুধু ডাকাত?—সে নিষ্ঠুর নরহন্তা, কত খুন যে করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার ফাঁশীতে এইবার সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। আপনি এই দেশে বেড়াইতে আসিয়াছেন, এদেশের একজন নামজাদা ডাকাতকেও দেখিবার সুযোগ আপনার ছাড়া উচিত নয়।

বেচারা মীর খাঁ ধরা পড়িয়াছে জানিয়া আমার কেমন একটু কষ্ট হইল। আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে স্বীকার করিলাম। পরদিন আমি প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের সুপারিশ লইয়া ডাকাত মীর খাঁর সহিত দেখা করিতে গেলাম—বিশেষ সুপারিশ না থাকিলে কাহাকেও তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইতেছিল না।

আমি যখন মীর খাঁর হাজতে গেলাম তখন সে সদ্য আহার সমাপ্ত করিয়া উঠিল। আমি তাহাকে সেলাম করিয়া কতকগুলি চুরুট উপহার দিলাম। সে নিতান্ত প্রথা রক্ষার মামুলি ধরণে একটু সেলাম করিল। সে আমার দেওয়া চুরুটগুলি হইতে গণিয়া ছয়টা চুরুট রাখিয়া বাকীগুলি ফিরাইয়া দিয়া বলিল—লুৎফে শুমা জিয়াদ্! কিন্তু আমার জীবন আর তিন দিন, কাজেই ছটার বেশী চুরুটের আমার আর দরকার হইবে না।

আমি তাহাকে বলিলাম—টাকা দিয়া হোক বা সুপারিশ করাইয়া হোক আমি আপনার অবশিষ্ট জীবনের কোনো অসুবিধা দূর করিতে পারিলে সুখী হইতাম।

সে প্রথমে কেবল মাত্র বিষণ্ণ ম্লান মুখে হাস্য করিল, তার পর অল্পক্ষণ পরে বলিল—কোনো মোল্লাকে দিয়া আমার আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করাইবার ব্যবস্থা করিতে যদি পারেন তবে অনুগৃহীত হইব।

তার পর সে একটু ভয়ে ভয়ে বলিল—আর—একজন জনানার জন্যও খোদার দোয়া প্রার্থনা করাইবেন কি? সে আপনার অপকার করিয়াছিল বলিয়া অনুরোধ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি।

আমি বলিলাম—নিশ্চয় করাইব। কিন্তু কোন্ স্ত্রীলোক আমার কি অপকার করিয়াছে তাহা ত আমি জানি না।

সে পরম পরিতৃপ্তির সহিত আমার ডাহিন হাত নিজের দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল—আপনার অশেষ অনুগ্রহ। তাই ক্রমশঃ সাহস বাড়িয়া যাইতেছে। আমি আর-একটি প্রার্থনা জানাইতে পারি কি?

আমি বলিলাম—নিশ্চয়! নিশ্চয়!

মীর খাঁ বলিতে লাগিল—আপনি দেশে ফিরিয়া যাইবার পূর্ব্বে আমার একটি কাজ করিবেন? আপনি ত দেশ দেখিতেই বাহির হইয়াছেন—আর-একটা নূতন দেশ দেখিয়া একটু ঘুরিয়া যাইবেন কি?

আমি বলিলাম—বলুন, কোথায় আমাকে যাইতে হইবে?

মীর খাঁ বলিল—ডেরা-ঘাজী-খাঁ—খুবসুরৎ শহর,……

আমি বলিলাম—সে ত আমার পথেই পড়িবে—আমি ত এখান হইতে মূলতান যাইব ঠিকই আছে।

মীর খাঁ গলা হইতে একটা রূপার মেডাল খুলিয়া একটা কাগজে মুড়িয়া আমার হাতে দিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, যেন উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগ দমন করিতে চেষ্টা করিতেছে; পরে ক্রন্দনসিক্ত গাঢ় স্বরে বলিল—ডেরা-ঘাজী-খাঁয়ের ইমান্‌দার মহল্লায় একজন বড় পুণ্যশীলা মহিলা আছেন, তাঁহার নাম ঠিকানা এই কাগজে লেখা আছে, তাঁহাকে এই মেডালটা পৌছাইয়া দিবার ভার আপনাকে লইতে হইবে। যদি তিনি আমার কথা জিজ্ঞাসা করেন, বলিবেন—আমার মৌত হইয়াছে, কিন্তু কেমন করিয়া আমার মৃত্যু হইয়াছে তাহা তাঁহাকে বলিবেন না।

আমি তাহার অনুরোধ পালনে স্বীকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনি ধরা পড়িলেন কেমন করিয়া?

মীর খাঁ রোদন-রুদ্ধ স্বরে বলিল—আজ আর আমি কিছু বলিতে পারিব না। কাল যদি মেহেরবানী করিয়া কদমদারী করেন তাহা হইলে কাল বলিব।

আমি ডাকাতের দুঃখে কাতর ও তাহার কাহিনী শুনিবার কৌতূহলে আগ্রহান্বিত হইয়া চলিয়া আসিলাম। প্রভাস-বাবুর বাসায় ফিরিয়া আসিয়া সেই মেডেল-মোড়া কাগজখানি খুলিয়া দেখিলাম—মীর খাঁ পঞ্জাব সীমান্তের মিলিটারী পুলিসের সুবাদার ছিল; সে ওয়াজিরিস্তানের যুদ্ধে বীরত্বের পুরস্কার

স্বরূপ এই মেডাল পাইয়াছিল ; এই মেডালটি সে তাহার মাকে দিয়া যাইতেছে। সেই কাগজখানিতে একটি সুন্দর কবিতাও লেখা ছিল,—কবি সত্যেন্দ্রকে তাহা আনিয়া দিয়াছিলাম, তিনি তাহার এইরূপ অনুবাদ করিয়াছিলেন—

"ঘোড়াটি আমার ভালবাসিত গো শুনিতে আমার গান,
এখন হতে সে ঘোড়াশালে বাঁধা র'বে সারা দিনমান।
জিনি' তরঙ্গ সুন্দরী মোর তাতার-বাসিনী সাকী,
লীলা-চঞ্চলা রঙ্গনিপুণা,—শিবিরে এসেছি রাখি' !
ঘোড়ার আমার জুটিবে সওয়ার, ইয়ার পাইবে সাকী,
শুধু মা আমার এ বুড়া বয়সে কাঁদিয়া মুদিবে আঁখি !"

এই কবিতাটি পড়িয়া আমরা ডাকাতের মাতৃভক্তি মাতৃস্নেহ দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই।

পরদিন আবার মীর খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাহার ধরা পড়ার কাহিনী শুনিতে চাহিলাম। সে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত গল্পটি বলিল—

— ৩ —

আমি ধরা পড়িলাম আপনার পরিচিত ফিরোজার জন্য। তাহার জন্য কেমন করিয়া ধরা পড়িলাম তাহা বুঝাইতে হইলে আমার সমগ্র জীবনকাহিনী বলিতে হইবে।

আমি বেলুচী। ডেরা-ঘাজী-খাঁ আমার জন্মস্থান। আমার নাম মীর মহম্মদ খাঁ। আমার পিতা ছিলেন বেলুচী সর্দ্দার, আমার মাতাও সর্দ্দারের কন্যা। কাজেই আমার খাঁ উপাধিতে জন্মগত অধিকার আছে। ইংরেজরা যখন বেলুচিস্তানের কিয়দংশ দখল করে, তখন আমার ওয়ালিদ্ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া মাকে লইয়া ডেরা-ঘাজী-খাঁয়ে সওদাগরী করিতে আরম্ভ করেন। সেইখানে আমার জন্ম হয়। আমি মদ্রাসাতে কিছুদিন লেখাপড়াও করিয়াছিলাম; কিন্তু লেখাপড়ার চর্চ্চা অপেক্ষা শরীরের তাকত বাড়ানো ও পহল্বানী করাতে আমি অধিক আনন্দ পাইতাম—তাহাই আমার সর্ব্বনাশের মূল হইল। আমি ফৌজে ভর্ত্তি হইয়া সিপাহী হইলাম। আমার অশ্বচালন-দক্ষতার জন্য আমি শীঘ্রই সওয়ার নিযুক্ত হইলাম। এই সময় ওয়াজিরিস্তানে লড়াই লাগিলে আমার লশ্ কর্ টিরা-লড়াইয়ে রওয়ানা হইল। আমি সেখানে মর্দানগী (পৌরুষ) ও দিলাবরী (বীরত্ব) দেখাইয়া সুবাদার নিযুক্ত হইলাম ও সেই সময় সীমান্ত প্রদেশে হঙ্গামা লাগিয়া ছিল বলিয়া আমি মিলিটারী পুলিসে বদ্লী হইলাম।

কিছুদিন আমি সর্কারী কার্পেট্-কার্খানার পাহারাদার ছিলাম। একদিন আমি তখন পাহারায় ছিলাম না;—অন্য লোকে অবসরের সময় তাস পাশা খেলিত, আমি পিতলের তার বুনিয়া বুনিয়া চেন বানাইতাম তোষদান গলায় ঝুলাইয়া রাখিবার জন্য;—আমি চেন বুনিতেছিলাম। আমার সঙ্গীরা হঠাৎ

খেলা ফেলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল, তাহারা বলাবলি করিতেছিল শুনিলাম—কারখানার ঘড়ী বাজিয়াছে, এইবার আওরৎলোগ কারখানায় আসিবে!

সেই কারখানায় শ দুই তিন জনানা মজ্‌দুরণী কাজ করিত। তাহারাই পশম আঁচ্‌ড়ায়, বাছে, ধুনে, সূতা পাকায়, গালিচা বুনে; তাহারা যেখানে কাজ করে সেখানে মরদ লোকের কাহারো যাইবার হুকুম নাই, কারণ গরমের সময় জনানারা গায়ের কাপড় খুলিয়া কাজ করে। এত জনানা এক সঙ্গে কারখানায় আসে ও যায়, ইহা দেখিবার জন্য পথে দস্তুর-মত ভীড় জমে। বুড়ী হইতে বালিকা—সব বয়সের মেয়েই থাকে; কোনো কোনো যুবতী আবার বোরকা পরে না, ওড়্‌না দিয়া ঘোম্‌টাও দেয় না—তাহারা শিকারী, শিকারের সন্ধানী।

যখন সকল লোকে লোলুপ নেত্রে রমণীদের শোভা-যাত্রা দেখিতেছিল তখন আমি পথের ধারে একখানা বেঞ্চিতে বসিয়া আপন মনে কাজ করিতেছিলাম। আমার বয়স তখন অল্প, মায়ের কোল ছাড়িয়া বিদেশে মন হুহু করিত; তাহার উপর আমার ধারণা ছিল বেলুচী ছাড়া যথার্থ সুন্দরী কোথাও নাই, এ দেশের মেয়েগুলা ত মরদের সামিল! আমি তাহাদের পাহাড়িয়া আচরণে তাহাদিগকে ভয়ের চক্ষে দেখিতাম। তাহারা চঞ্চল, রহস্যপ্রিয়, ব্যাপিকা। আমি চেন গাঁথিতে গাঁথিতে শুনিলাম কাহার কণ্ঠে যেন সেতার ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—আরে দেখ দেখ! পরম সুবোধ মনোযোগী শিশু!

আমি মুখ তুলিয়া দেখিলাম—আমার জীবনের সেই দিন ও সেই দর্শন কখনো ভুলিতে পারি নাই; সে দিন ছিল জুম্মা বার, আর দেখিলাম ফিরোজাকে—তাহাকে আপনিও কয়েক দিন আগে দেখিয়াছেন।

ফিরোজার পরণে ছিল ফিরোজা রঙের পেশোয়াজ, ফিরোজা রঙের ঘাঘরা, ফিরোজা রঙের ওড়্না মাথার অর্দ্ধেক ঢাকিয়া তুই কাঁধের উপর দিয়া সাম্নের দিকে লুটাইয়া ঝুলানো। তাহার পায়ে ছিল তুখানি ছোট ছোট পাতলা হাল্কা লাল চাম্ড়ার জরিদার জুতা। তাহার ওড়্নার আবরণ ভেদ করিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছিল জরিদার কালো রেশমী দড়ি দিয়া বিনানো দীর্ঘ বেণী, তাহাতে একগুচ্ছ গন্ধব্যাকুল হেনার মঞ্জরী গাঁথা! তাহার মুখে দাঁতে চাপা ছিল একটা ডালপাতা-সুদ্ধ আনার-কলি! সে তুই হাত কোমরে দিয়া চলিতেছিল যেন টাটুঘোড়ার কদম-চালে নাচিয়া নাচিয়া—তাহার চলনে কুরঙ্গের রঙ্গ, ময়ূরের নর্ত্তন-শিহরণ, দরিয়ার ঢেউয়ের দোলন-তাল! কত লোকে তাহাকে বাহবা দিতেছিল, তারিফ করিতেছিল,—এবং সেও কটাক্ষে হাস্যে সকলকে মুগ্ধ তুষ্ট করিয়া দিতে দিতে চলিতেছিল।

তাহার স্বর শুনিয়া ও রূপ দেখিয়া আমি একটু চমৎকৃত হইলেও প্রথমে সে আমাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ তাহার হাবভাব চালচলনে আমি বিরক্তই বোধ করিয়াছিলাম। আমি চোখ নামাইয়া আবার আমার কাজে মন দিলাম।

স্ত্রীলোক ও বিড়ালের স্বভাব একরকম—ডাকিলে তাহারা কাছে আসে না, কিন্তু উপেক্ষা করিয়া অন্যমনস্ক থাকিলেই তাহারা চুরি করিতে আসে। হাজারো লোকের প্রশংসমান দৃষ্টি ও বাক্যের মধ্যে আমার অবহেলাই তাহাকে আমার দিকে আকর্ষণ করিল,—সে আমার সম্মুখে আসিয়া, এক পা আগে ও এক পা পিছে দিয়া, পিছন দিকে একটু হেলিয়া, ঘাড় একটু বাঁকাইয়া, কোমরে দুই হাত দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—কুদক্ (খোকা), তোমার জঞ্জীর আমাকে বখ্‌শিশ করিবে?

আমি একবার বিরক্ত দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিয়া আবার দৃষ্টি নত করিয়া বলিলাম—এটা আমার তোষদান ঝুলাইবার জন্য বানাইতেছি।

সে ঠোঁটের এক কোণে ডালিম-ফুল ও অপর-কোণে তেমনি রঙীন বিদ্রূপের হাসি চাপিয়া ধরিয়া বলিল—আ দুখ্‌তরক্ (দুহিতৃকা, খুকী), তুমি তোমার গলার হার বুনিতেছ!

তাহার এই অকারণ রূঢ় বিদ্রূপে সমস্ত জনতার হাস্যরোলে আকাশ বাতাস যেন বজ্রবিদীর্ণ হইয়া গেল। আমি লজ্জায় ক্রোধে বিরক্তিতে লাল হইয়া উঠিলাম। কিন্তু স্ত্রীলোক সে, তাহাকে কোনো জবাব দিতে পারিলাম না। চুপ করিয়া নত মুখে বসিয়া ঘামিতে লাগিলাম।

সে আবার বলিল—আচ্ছা দিল্‌ফরিব (মনোচোর), আমার জন্য একটা মালা গাঁথিয়া দিবে কি?

এই বলিয়াই সে তাহার ঠোঁটে-চাপা ডালিম-ফুলটি হাতে

লইয়া আমার কপালে ছুড়িয়া মারিল, আমার মনে হইল আমি একটা বন্দুকের গুলিতে আহত হইলাম, ফুলটা আমার কপাল-ভাঙা রক্তের ডেলার মতন আমার কোলে আসিয়া পড়িল। আমি যে আমাকে লইয়া তখন কি করিব, কোথায় লুকাইব, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিল্যাম না; কাঠের মতন আড়ষ্ট হইয়া বসিয়াই রহিলাম। সে কার্‌খানায় চলিয়া গেল; সকল লোকের দৃষ্টি তাহাকেই অনুসরণ করিল; আমি সকলের দৃষ্টি অন্যদিকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি কোলের ফুলটা তুলিয়া বুকের ভিতরে লুকাইলাম—অপমান ঢাকিবার জন্য। শয়তানী ডাইনীর বমন-করা রক্তের ডেলার মতন ফুলের আঘাত লাগিয়া আমার কপাল ত ভাঙিয়াইছিল, এখন তাহাকে বুকে থুইয়া তাহার ছোঁয়াচে বুকও ভাঙিবার সূত্রপাত করিলাম! শয়তানীর মন্ত্রপড়া জাদুভরা ফুল তুলিয়া বুকে থোওয়া আমার প্রথম বেওকুফী, নেহাৎ আহাম্মকী হইল!

দু-তিন ঘণ্টা পরে—তখনো আমি তাহারই অপমানের জ্বালায় জ্বলিতেছিলাম, আমার সমস্ত মন তন্ময় হইয়া গিয়াছিল—কার্‌-খানার এক চৌকীদার ছুটিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ভয়ানক সন্ত্রস্ত ও ব্যস্ত ব্যাকুল ভাবে থানায় আসিয়া খবর দিল—কার্‌খানায় একটা আওরৎ খুন হইয়াছে, খুনীকে কেহ গেরেপ্তার করিতে পারিতেছে না, পুলিস চাই। আমাদের অফিসার-সাহেব আমাকে হুকুম করিলেন দুজন সিপাহী সঙ্গে লইয়া কার্‌খানায় যাইয়া তদারক ও ব্যবস্থা করিতে। আমি দুজন সিপাহী লইয়া কার্‌খানায়

গেলাম। কারখানা-ঘরে ঢুকিয়া হাটের গণ্ডগোলে ত কালা হইয়া যাইবার জোগাড়। দু-তিন শত স্ত্রীলোক আলুথালু হইয়া স্রস্তবেশে চীৎকার করিতেছে, কাঁদিতেছে, নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী করিতেছে, ছুটাছুটি করিতেছে। সেই গণ্ডগোলে শিথিলবাসা স্ত্রীলোকদের ঠেলিয়া অগ্রসর হওয়াও কষ্টকর, কাহাকেও কিছু কথা শুনাইবার চেষ্টা করাও পণ্ডশ্রম—সেখানে বজ্রপাত হইলেও বোধ হয় কেহ শুনিতে পাইত না, কোলাহলে সে শব্দ ডুবিয়া তলাইয়া যাইত। অনেক কষ্টে ভীড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়া দেখিলাম —একটা স্ত্রীলোক রক্তাক্ত হইয়া মেঝের উপর লুণ্ঠিত হইতেছে, কতকগুলি স্ত্রীলোক তাহার ক্ষতস্থানে জল ঢালিয়া পটি বাঁধিয়া রক্ত রোধ করিবার চেষ্টা করিতেছে; সেই আহত স্ত্রীলোকটির সম্মুখে দৃপ্ত ভঙ্গীতে কোমরে হাত দিয়া পিছন দিকে মাথা হেলাইয়া আগে পিছে পা রাখিয়া দৃঢ় ভাবে দাঁড়াইয়া আছে সেই ফিরোজা!—পাঁচ ছয় জন মেয়ে তাহাকে দুইদিক্ হইতে ধরিয়া আছে—যেন দুষ্ট ঘোড়াকে টহল করাইতে লইয়া চলিয়াছে। আহত স্ত্রীলোকটি যন্ত্রণায় ও ভয়ে ভয়ানক চীৎকার করিতেছিল —গালি পাড়িতেছিল, ছটফট করিয়া লুণ্ঠিত হইতেছিল, তাহার মৃত্যু আসন্ন মনে করিয়া মোল্লার কাছে আল্লার দোয়া প্রার্থনা করিতেছিল। ফিরোজা দাঁতে দাঁত চাপিয়া ঠোঁট বাঁকাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গিরগিটির মতন চোখ পাকাইয়া পাকাইয়া চোখের তারা গড়াইয়া গড়াইয়া সকলকে দেখিতেছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ব্যাপার কি ? কি হইয়াছে ?

তিন শ স্ত্রীলোক একসঙ্গে জবাব দিয়া উঠিল।

অনেক কষ্টে আমি যাহা বুঝিতে পারিলাম, তাহার সার মর্ম্ম এই—

আহত স্ত্রীলোকটি নিজের সঞ্চিত অর্থের দেমাক দেখাইয়া বলিয়াছিল তাহার যে টাকা জমিয়াছে তাহাতে একটা তাজী ঘোড়া সে কিনিতে পারে। তাহার উত্তরে মুখরা ফিরোজা বলিয়া উঠিয়াছিল—"ওয়া ইস্‌ৎ (সত্য নাকি)! নে, থাম্ থাম্! তোর একখান চিরুণী কিনিবার মুরাদ নাই—তুই কিনিবি ঘোড়া! তুই একটা টিকৃটিকি কিনিয়া চড়িস!" অপর স্ত্রীলোকটি হয়ত গালিচার পশম আঁচ্‌ড়াইবার চিরুণী একখানা চুরি করিয়াছিল; তাই সে ফিরোজার বিদ্রূপে ক্ষিপ্ত হইয়া বলিল—"আমি ত চিরুণীর খবর কিছু জানি না—আমি ত ইরাণী বেদেনীও নই, শয়তানের বেটীও নই। কিন্তু ফিরোজা খানুম শীঘ্রই আমার ঘোড়ার খুরের ধূলায় ধূসর হইয়া কারখানায় আসিয়া চিরুণীর খবরদারী করিবেন।" ফিরোজাকে বাপ তুলিয়া গালি দেওয়াতে সে বলিল—"আমি ধূসর হইয়া চিরুণীর খবরদারী করিবার আগে তোকে চিরিয়া লাল করিয়া দিব।" এবং এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই কোমর হইতে পশমী দড়ি কাটা ছোরা টানিয়া ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস করিয়া তাহার গালে একটা ঢেরা কাটিয়া দিল। ফিরোজার অপরাধ সুস্পষ্ট। সে একটি কথারও প্রতিবাদ করিল না।

আমি ফিরোজার বাহুতে হাত দিয়া নম্র ভদ্র স্বরে বলিলাম—বাজি! তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।

ফিরোজা আমার দিকে পরিচয়ের দৃষ্টি হানিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—দিল্‌চশ্‌প্‌ (চিত্তাকর্ষক) তুমি, তোমার বাসর-ঘরে আমার নিমন্ত্রণ! চলো তবে!—আমার ওড়্‌নাখানা কোথায় গেল?

সে ওড়্‌নাখানা লইয়া এমন করিয়া ঘোমটা দিল যে তাহার চোখ দুটি ছাড়া মুখের সমস্তই ঢাকা পড়িল। এবং সে আমার সঙ্গী সিপাহীদের মাঝখানে নিতান্ত নিরীহ পোষা প্রাণীটির মতন চলিতে লাগিল।

আমরা থানায় পৌছিলে ফৌজদার সাহেব সমস্ত শুনিয়া ফিরোজাকে ছয় মাস কয়েদ থাকিবার হুকুম দিলেন—মিলিটারী পুলিসের সরাসরি বিচার এক দণ্ডেই শেষ হইয়া গেল। আমার উপর আবার ভার পড়িল ফিরোজাকে জেলখানায় পৌছাইয়া দিবার। দুইজন সিপাহীর মাঝখানে তাহাকে রাখিয়া আমি পিছনে পিছনে চলিতে লাগিলাম।

থানা হইতে জেলখানা অনেক দূর। আমরা চারজনে নীরবেই পথ চলিতেছিলাম। যখন আমরা জিলেপী-গলিতে পৌছিলাম—গলির পেঁচ ও বাঁকের জন্ত ঐ নাম হইয়াছে—তখন ফিরোজা তাহার শয়তানী শুরু করিল—সে তাহার ঘোমটা খুলিয়া ফেলিয়া তাহার স্থন্দর মুখখানি ফিরাইয়া মৃদু মধুর স্বরে

আমাকে বলিল—দিল্‌দার ইয়ার, আমাকে তুমি কোথায় লইয়া যাইতেছ ?

আমি স্ত্রীলোককে—সুন্দরী যুবতী রমণীকে—সম্ভাষণের উপযুক্ত মোলায়েম স্বরে বলিলাম—কয়েদখানায় লইয়া যাইতেছি, বাজি !

ফিরোজা বলিল—তুমি আমাকে ত দর্শন মাত্রেই কয়েদ করিয়াছ ! আমাকে তোমাব কয়েদী করিয়া নিজের হেফাজতে রাখিয়া দাও—আমাকে পরের হাওয়ালা করিও না। তুমি নও-জওয়ান (নবযৌবন), মেহেরবান্ কদর্‌দান্ ! আমাকে দয়া করো—আমাকে পালাইতে দাও। আমি তোমাকে এমন একটা জাদুর তুক্ শিখাইয়া দিব যে তুমি জনানা-জান্ হইবে —যে রমণীকে তুমি চাহিবে সে তোমার প্রণয়ে পাগল হইবে।

আমি মনে মনে খুশী হইলেও যথাসম্ভব গম্ভীর হইয়া বলিলাম —এখন আবোল-তাবোল বাজে বকুনির সময় নয়—তোমাকে কয়েদখানায় যাইতে হইবে, তোমাকে সেখানে পৌঁছাইয়া দিবার হুকুম আমার উপর আছে। ইহা অন্যথা করিবার উপায় নাই —ইহার আর চারা নাই।

আমরা এতক্ষণ পশ্‌তু ভাষাতেই কথা বলিতেছিলাম। পশ্‌তু ভাষায় আমার ভালো দখল ছিল না ; আমি যে বিদেশী তাহা আমার কথার টান ও দু চারটা কথায় ধরিয়া ফেলিয়া ফিরোজা পরিষ্কার বেলুচী ভাষায় বলিয়া উঠিল—আয়্

হম্‌-ওয়তন্‌ (স্বদেশবাসী), তুমি বেলুচী ব্রাহুই! আমার স্বজাতি! স্বদেশী বন্ধু!

প্রবাসব্যথিত আমি স্বদেশের কথা ও ভাষা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম; আমি বলিলাম—হাঁ, আমরা মুসা খেল্‌, তোমাদের বাড়ী আর খেল্‌ কোথায়?

ফিরোজা বলিয়া উঠিল—আমরাও ত মুসা খেলের লোক! দেশে আমার মা আছে; আমি এদেশে আসিয়া পড়িয়াছি; কিছু টাকা রোজ্‌গার করিয়া দেশে ফিরিয়া যাইব বলিয়া কার্‌-খানায় কাজ করিতেছিলাম। আমার মন সফেদ কোহ্‌ পাহাড়ের কোলে ফিরিয়া যাইবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। কিন্তু দেখ না মাঝখান হইতে কি দুর্দ্দৈব ঘটিয়া গেল। আচ্ছা তুমিই ত বলো ইয়ার, কেহ যদি বলে সব বেলুচী ন-তাকৎ ন-মরদ্‌, তবে কি তাহাকে না মারিয়া থাকা যায়? সেই অওরৎটা এই রকম আস্পর্দ্ধার কথাই বলিতেছিল!

ফিরোজা মিথ্যা কথা বলিতেছিল সাহেব; সে সর্ব্বদাই মিথ্যা কথা বলে; সারা জীবনে সে কখনো একটাও সত্য কথা কহিয়াছে কি না সন্দেহ। কিন্তু সে এমন মিষ্ট করিয়া মিথ্যা কথা বলিতে পারে যে তাহাকে অবিশ্বাস করা অসাধ্য। আমি সর্ব্বদা তাহার কথা বিশ্বাস করিয়াছি, ঠকিয়াছি, আবার বিশ্বাস করিয়াছি। আমার অপেক্ষা তাহার মনের বল এত বেশী! সে চোখে মুখে প্রত্যেক অঙ্গে কথা কহিয়া আমাকে একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ অভিভূত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, আমি একেবারে ভেড়া বনিয়া গেলাম, আর

কোনোদিকে আমার মনোযোগ ছিল না, আমি তন্ময় হইয়া তাহার বাক্যসুধা পান করিতেছিলাম—মনপ্রাণ দিয়া, সর্ব্বেন্দ্রিয় দিয়া তাহার কথা ও রূপ উপভোগ করিতেছিলাম। সে ক্রমাগত আমার স্বদেশকে প্রশংসা করিয়া করিয়া আমার মনকে গর্ব্বে ভরিয়া তুলিতেছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতেছিল যে আফ্রিদিরা আমার স্বদেশবাসীকে কাপুরুষ ভীরু বলিয়া উপহাস করে। আমার সঙ্গী আফ্রিদি সিপাহী দুজনের প্রতি আমার মন বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, আমার এমন রাগ হইতেছিল যে তাহারা যদি তখন একটা কথা কহিত ত আমি ফিরোজার মতন তাহাদেরও মুখে ছোরা দিয়া ঢেরা কাটিয়া দিতাম। আমি যেন ফিরোজার কথার নেশায় মাতাল হইয়া উঠিয়াছিলাম; আমি মাতালের মতন যা-তা আবোল-তাবোল বকিতে আরম্ভ করিলাম এবং যে-কোনো বোকামি করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিলাম।

হঠাৎ সে আমাকে বলিল—আয়্ হম-ওয়তন্, যদি আমি তোমাকে হঠাৎ ধাক্কা দি আর তুমি উল্টাইয়া পড়িয়া যাও, তাহা হইলে এই দুটা আফ্রিদি গাধার মাঝখান হইতে আমি উধাও হইয়া যাইতে পারি।

আমি আমার কর্ত্তব্য ভুলিয়া গেলাম, বলিলাম—খয়ের, হম্-ওয়তন্, তুমি চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারো; ইন্‌শা আল্লা, তুমি খালাস হইয়া পলাইয়া যাইতে পারিবে।

আমরা তখন এক সরু গলির ভিতর দিয়া চলিতেছিলাম, ফিরোজা হঠাৎ ফিরিয়া আমার বুকে দুই হাত দিয়া ধাক্কা দিল;

আমি ইচ্ছা করিয়া একেবারে চিৎপাত হইয়া পড়িয়া গেলাম ; ফিরোজা এক লঘু লম্ফে আমাকে ডিঙাইয়া আমার চোখের উপর বিদ্যুৎঝলকের মতন তাহার ছোট ছোট শুভ্র সুন্দর পা-দুখানি চম্‌কাইয়া পাশের গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। তাহার পা দুখানি যেমন সুঠাম তেমনি ক্ষিপ্রগতি—সে নিমিষের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

আমি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলাম ; কিন্তু দৌড়িয়া গিয়া আমার হাতের বল্লমটা এড়ো করিয়া সরু গলির মুখে দুই বাড়ীর দেওয়ালে আট্‌কাইয়া ফেলিলাম, যেন অপর সিপাহী দুজন তখনই গলির মধ্যে ঢুকিতে না পারে এবং ফিরোজা পলাইবার সময় পায়। পরে, যেন তাড়াতাড়িতে বল্লমটা গলির মুখে আড়াআড়ি আট্‌কাইয়া গিয়াছিল এমনি ভাবে মহা ব্যস্ততার ভান করিয়া বল্লম খুলিয়া লইয়া ফিরোজার পশ্চাতে ছুটিলাম—তখনো আগে আমি, আমার পিছনে সিপাহী দুজন,—যদি দর্‌কার হয় আমি আবার তাহাদের পথ আড়াল করিয়া তাহাদিগকে বাধা দিতে পারিব। আমরা এমিউনিশান-বুট পরিয়া দৌড়িয়া গিয়া যে ফিরোজাকে ধরিব তাহার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। আপনাকে বলিতে যত সময় লাগিল, তাহার চেয়েও অল্প সময়ে কয়েদীর আর কোনো পাত্তাই কোথাও রহিল না। বিশেষতঃ, তখন কার্‌খানার ছুটি হইয়া গিয়াছিল, দলে দলে মেয়ে কাজ হইতে বাড়ী ফিরিতে-ছিল ; সেই ভীড়ে ফিরোজা যে কোথায় মিশিয়া গেল তাহার

আর কোনো সন্ধানই রাখা গেল না, অধিকন্তু মেয়েরা আমাদের ভুল দিক্ দেখাইয়া দিয়া ও একজন স্ত্রীলোককে ধরিতে অক্ষম বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া আমাদের একেবারে নাজেহাল করিয়া দিল। বৃথা খোঁজাখুঁজি ছাড়িয়া আমরা কয়েদখানার রসিদ না লইয়া খালি-হাতে থানায় ফিরিয়া আসিলাম।

আমার সঙ্গী সিপাহীরা সাজা হইতে বাঁচিবার জন্য বলিয়া দিল যে ফিরোজা ও আমি বেলুচী ভাষায় কথা কহিয়াছি। এবং বিচারকের কাছে ইহা বিশ্বাস্য বোধ হইল না যে ফিরোজার মতন একটি তন্বী তরুণীর ধাক্কায় আমার মতন জোয়ান পড়িয়া যাইতে পারে। আমার বিরুদ্ধে সন্দেহ—সন্দেহ কেন, সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রবল হইয়া উঠিল। আমি সুবাদার-পদ হইতে আবার সামান্য সিপাহীতে অবনীত হইলাম এবং কয়েদীকে ছাড়িয়া দেওয়ার অপরাধে আমার এক মাস ফাটক হইল। পল্টনে ভর্ত্তি হওয়ার পর এই আমার প্রথম সাজা। মনে করিয়াছিলাম শীঘ্রই আমি সুবাদার-মেজর হইব ; সাজা পাওয়াতে সেই আশা বিসর্জ্জন দিতে হইল।

জেলের মধ্যে আমার দিন বিষাদে বিষাক্ত বোধ হইতে লাগিল। আমার কেবলই মনে হইতে লাগিল, আমার অধীনস্থ মোগল বাজ খাঁ, নিয়ামৎ, শের আলি, হবিবউল্লা—তাহারা সকলেই অফিসার হইয়া যাইবে, আর আমি তাহাদের তাবেদার থাকিয়া তাহাদের হুকুম তামিল করিব। আমার চরিত্রে যে কলঙ্কের কালির ছাপ লাগিয়া গেল, তাহা মুছিয়া উপরওয়ালাদের

অনুগ্রহ আকর্ষণ করিতে বহুদিন বহু পরিশ্রম করিতে হইবে—আগের চেয়ে এর পরে দশগুণ বেশী পরিশ্রম ও হুশিয়ারী দেখাইলেও আমার প্রতি পূর্ব্ব বিশ্বাস ও নির্ভরতা ফিরিয়া আসিতে বহুদিন লাগিবে। এতদিন যে সাধুতা ও নিষ্ঠার সহিত কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি তাহা একদিনের আহাম্মকীতে বরবাদ হইয়া গেল। আমিই আমার এই সর্ব্বনাশ করিলাম, অথচ শাস্তিও হইল আমারই। কিন্তু এত ক্ষতি স্বীকার করিলাম কিসের জন্য? এক রত্তি একটা ইরাণী বেদেনীর মিথ্যা মিষ্ট কথার নেশায়! সে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়াছিল বিদ্রূপ দিয়া; তার পর এখন সে কোথায়, আর কখনো তাহার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবে কি না তাহাই বা কে বলিবে? এমন তুচ্ছের জন্য মিথ্যার মোহে সর্ব্বনাশের নেশায় আর কোনো আহাম্মক মাতে কি না আমার ত জানা নাই।

আমার সর্ব্বনাশের মূল বলিয়াই তাহারই চিন্তায় আমার মন আচ্ছন্ন হইয়া গেল—তাহার কথা না ভাবিয়া থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তাহার সেই ছোট ছোট শুভ্র সুন্দর পা দুখানি যেন আমার চোখের সাম্‌নে নিরন্তর নৃত্য করিতেছে, যেন এক জোড়া শাদা কবুতর তাহাদের ছবির ছাপ বাতাসের বুকে রাখিয়া আমার চোখের সাম্‌নে দিয়া উড়িয়া গিয়াছে! আমি কয়েদখানায় বসিয়া বসিয়া মোটা-মোটা-শিক-দেওয়া জানালার ফাঁক দিয়া দুনিয়ার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া থাকিতাম, কত রমণীর রমণীয় গতিলীলা নিরীক্ষণ করিতাম,

কিন্তু সারা দুনিয়ার কিছুই সেই তরুণী শয়তানীর সমকক্ষ বলিয়া বোধ হইত না—ধরণী যেন তাহাকে ধারণ করিতে পাইয়াই বসুমতী হইয়াছে, বসুন্ধরা হইয়াছে! এমনই করিয়া ভাবিতে ভাবিতে অনিচ্ছাতেও আমি তাহার উচ্ছিষ্ট সেই ডালিম-ফুলটা হাতের মুঠায় বুকের উপর চাপিয়া ধরিতাম!—সেই ফুলের পাপ্‌ড়ি ঝরিয়া গিয়াছে, বর্ণ-সুষমা ম্লান হইয়া গিয়াছে, কিন্তু স্মৃতি তাহাকে ঘিরিয়া ছিল—এক কণা মাস্কে (মৃগমদে) সমগ্র মৃগনাভির উগ্র গন্ধের উন্মাদনার মতন! শুনিয়াছি ডাইনী আছে; সে কথা যদি সত্য হয়, কোথাও যদি কোনো জাদুগর্‌নী থাকে, তবে ফিরোজা শয়তানী তাহাদের একজন, তাহাদের সর্দ্দার্‌নী!

আমার পূর্ব্বের ব্যবহারের ও জেলে আসার পরের আচরণের পরিচয় পাইয়া জেলর-সাহেব আমাকে খুব খাতির করিতেন, আমার সহিত সদয় ব্যবহার করিতেন। একদিন তিনি আমার কুঠুরীতে আসিয়া একখানা পাঁউরুটি দেখাইয়া বলিলেন—দেখ মীর খাঁ, তোমার স্ত্রী কি উপহার পাঠাইয়াছে!

আমার স্ত্রী কেহ কোথাও ছিল না। হয়ত ইহা আর কাহারও স্ত্রী আর-কোনো কয়েদীকে উপহার দিয়াছে, ভুলক্রমে আমার নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। হোক ভুল—টাট্‌কা রুটি, বাদাম্‌-কিশ্‌মিশ-পেস্তা দিয়া খচিত নান-ই-শিরিন্‌—তাহা দেখিয়া আর ভুল ভাঙিবার প্রবৃত্তি হইল না; আমি জেলর-সাহেবকে ধন্যবাদ জানাইয়া রুটিখানা গ্রহণ করিলাম।

আমার অজানা অচেনা স্ত্রীর প্রণয়-উপহার রুটিখানা খাইবার

উপক্রম করিতেই আমার হাসি পাইল—কাহাকে বঞ্চিত করিয়া কাহাকে ঠকাইয়া কাহার প্রণয়ে আমি ভাগ বসাইতেছি। আর ইতস্তত না করিয়া রুটিতে দাঁত বসাইলাম—দাঁতে শক্ত কঠিন একটা কি ঠেকিল। রুটিখানা ভাঙিয়া দেখিলাম রুটির মধ্যে আছে একটা ছোট্ট বিলাতী উখা আর একটা আশ্‌রফী! আমার এই স্ত্রীটি যে কে তাহা বুঝিতে আর বিলম্ব হইল না, এ যে আমারই জন্য প্রেরিত রুটি তাহাতেও আর সন্দেহ রহিল না,—এই উপহার ফিরোজা বিবির। রুটি তন্দুরে সেঁকিবার আগে কাঁচা ময়দার মধ্যে সে উখা ও আশ্‌রফী ঢুকাইয়া দিয়াছিল আমাকে কয়েদ হইতে মুক্তি দিবার জন্য! তাহাকে মুক্তি দিয়া আমি অবরুদ্ধ হইয়াছি, ইহা সে বর্‌দাস্ত্ করিতে পারিতেছিল না। তাহারা ইরাণী বেদেনী, তাহাদের বন্ধন কোথাও নাই, সারা দুনিয়া তাহাদের ঘর, আস্‌মান্ তাহাদের আচ্ছাদন, মুক্ত হাওয়া তাহাদের সহচর! তাহারা একদিনের আটক হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য সারা শহরে আগুন লাগাইয়া দিতে পারে। চতুরা চালাক তরুণী এইজন্যই জেলর-সাহেবকে ঠকাইয়া আমার কাছে মুক্তির উপায় পৌঁছাইয়া দিয়াছে। ঘণ্টা-খানেক ঘষিতে পারিলেই মোটা শিকও ঐ উখার মুখে ক্ষয় হইয়া দুখণ্ড হইয়া যাইবে; তাহার পর যে লোক ছেলেবেলা হইতে খাড়া পাহাড়ের গা বাহিয়া পাখীর ছানা পাড়িয়া বেড়াইয়াছে, তাড়া করিয়া পাহাড়িয়া ছাগল ধরিয়াছে, গাছের শিকড় ধরিয়া ঝুলিয়া গভীর খাদে নামিয়াছে, তাহার পক্ষে

ঘরের জান্‌লা হইতে লাফাইয়া উঠানে বাহির হওয়া ও দেওয়াল টপ্‌কাইয়া বাহিরে পৌঁছানো খুব কঠিন কাজ মনে হইবার কথা নয়। বাহিরে গিয়া আশ্‌রফীর মহিমায় জেল-পোশাক বদল করিয়া সীমান্ত পার হইয়া স্বাধীন হওয়া সে ত হাতের পাঁচ বলিলেও হয়। কিন্তু পলাইবার ইচ্ছা আমার ছিল না। আমি কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া দণ্ডিত হইয়াছি—এ দণ্ড আমার ন্যায্য প্রাপ্য, অবশ্য-ভোগ্য। সিপাহীর ইমান্ আমি একবার নষ্ট করিয়াছি ফিরোজার খাতিরে; এখন ফের তাহা আমার নিজের জন্য নষ্ট করা অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ বলিয়া আমার বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু ফিরোজার এই মমতার পরিচয়ে আমি মুগ্ধ হইলাম, সে নিজেকে আমার স্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিয়াছে,— আমার জেল-খাটা সার্থক বোধ হইতে লাগিল। যখন কেহ ফাটকে আটক থাকিয়া বাহির দুনিয়ার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া থাকে, তখন ইহা ভাবিতেও সুখ হয় যে বাহিরে এমন আত্মীয় বন্ধু কেউ আছে যে সেই বন্দীকে স্মরণ করিয়া ব্যথিত হইতেছে। কল্পনায় ভাবিতেও যাহাতে সুখ, তাহার বাস্তবিক পরিচয় পাইয়া আনন্দের অবধি রহিল না। কিন্তু তাহার টাকা পাঠানোতে আমার আত্মসম্মানে আমি আঘাত অনুভব করিতে লাগিলাম—আমি কি তাহাকে মুক্তি দিয়াছিলাম এক আশ্‌রফী ঘুষের লোভে! সে কি তাহার মুক্তির মূল্য দিয়া আমার কাছে কৃতজ্ঞতার ঋণ হইতে অব্যাহতি পাইতে চায়! এই কথা মনে হইতেই মোহরটা তাহাকে ফিরাইয়া দিবার জন্য

ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম ; কিন্তু আমার মহাজনকে আমি কোথায় খুঁজিয়া পাইব, তাহার কর্জ্জ শোধ করা ত' সোজা কাজ নয়। ফিরোজার কর্জ্জ আমি সযত্নে লুকাইয়া রাখিলাম—কেবল উখাটা জেলর-সাহেবকে দিলাম তাহাতে আমার কয়েদ মাফ হইয়া গেল—আমি অন্যায় করিয়া পলায়ন না করিয়া যে সাধুতার পরিচয় দিয়াছি তাহার বখ্‌শিশ স্বরূপ আমি খালাস পাইলাম।

আমি মনে করিয়াছিলাম যে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত এই দণ্ডভোগে হইয়া গেল। কিন্তু অধিকতর অপমান আমার মুক্তির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া ছিল! একবার অন্যায় করিলে তাহার জের কিছুতেই শীঘ্র মিটিতে চায় না। আমি মুক্তি পাইয়া যখন আবার আমার কাজে নিযুক্ত হইলাম, তখন আমি আর অফিসার নহি, আমি—সামান্য সিপাহী—সকলের তাবেদার হুকুমবর্দার। এ যে কী অপমান তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। তাহার পর যখন বন্দুক ঘাড়ে করিয়া পাহারায় টহল দিতে যাই, তখন মনে হয় সারা দুনিয়ার লোকের চোখ যেন বন্দুকের গুলির মতন আমাকেই চাঁদমারি করিয়া বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। ইহার চেয়ে কোর্ট্‌-মার্শাল করিয়া আমাকে গুলি করিলে আমি খুশী মনে সহিতে পারিতাম!

আমি আমাদের পল্টনের কর্ণেল-সাহেবের বাড়ীতে পাহারা নিযুক্ত হইলাম। কর্ণেল-সাহেব সৌখীন যুবক, আমুদে, স্ফূর্ত্তিবাজ ধনী লোক। তাহার আস্তানায় রোজ মাইফেল লাগিয়াই থাকে। কত যুবক যুবতী যে রোজ সেখানে জমায়েৎ হইয়া

হল্লা করিত তাহার ইয়ত্তা ছিল না। আমার মনে হইত সকলে যেন আমাকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপহাস্য করিয়া অট্টরোল করিতেছে। একদিন আমি পাহারায় হাজির আছি, কর্ণেল-সাহেবের গাড়ী আসিয়া ফটকে খাড়া হইল। গাড়ী হইতে নামিল কে?—ফিরোজা! সে বাদ্‌শাজাদীর মতন সাজিয়া আসিয়াছিল—সোনায় সাটিনে জরিতে একেবারে ঝলমল! তাহার পোশাক ফিরোজা রঙের কিংখাবের, তাহার জুতা ফিরোজা রঙের কিংখাবের, তাহার ওঢ়্‌না ফিরোজা রঙের সাটীনের উপর জরির কাজ-করা; তাহার চুলে সোনার ফুল, তাহার কানে সোনার দুল, তাহার গলায় সোনার হার, তাহার দশ আঙুলে দশটা জড়োয়া আংটি। ফিরোজা রঙের পোশাকের মাঝখানে তাহার সুন্দর মুখখানি যেন আস্‌মানে পূর্ণচন্দ্রের মতন দেখাইতেছিল; সোনার ফুল দুল জরি যেন আস্‌মানের নক্ষত্ররাজি; তাহার কেশরাশি যেন চন্দ্রমুখের লোভে ঘনায়মান মেঘ; সে যেন মূর্ত্তিমতী রাত্রি! তাহার সর্ব্বাঙ্গে ফুলের ভূষণ! তাহার হাতে একটা খঞ্জনী। তাহার সঙ্গে আরো দুজন স্ত্রীলোক ছিল—একজন বৃদ্ধা ও অপরজন যুবতী। এ রকম নাচ-গানের মুজরা হইলে একজন বৃদ্ধা যুবতীদের খবরদারী করিবার জন্য সঙ্গে থাকে। তাহাদের পিছনে নামিল একজন সারেঙ্গী ও একজন তবলচী—নাচ-গানের সঙ্গে তাহারা সঙ্গত করিবে। সৌখীন লোকেরা প্রায়ই এই রকম মেয়েদের স্ফূর্ত্তি করিবার জন্য ও অন্যান্য নানা উদ্দেশ্যে ভাড়া করিয়া আনে।

ফিরোজা গাড়ী হইতে নামিয়াই আমাকে চিনিতে প্যারিল এবং আমাদের উভয়ের দৃষ্টি-বিনিময় হইয়া গেল। কিন্তু কেন জানিনা, তখন আমার মনে হইতেছিল যে মাটির একশ হাত নীচে আমার কবর হইলে ভালো হইত।

আমার বিকলতা বুঝিতে পারিয়া ফিরোজা বলিল— আহ্ বালে শুমা চে তোরস্ত্ মানুষ ? [ওগো লোকটি (বন্ধু), তোমার কি হইয়াছে ?] তুমি যেন আনাড়ী সিপাহীর মতন পাহারা দিতেছ ?

আমি জবাব দিবার কথা খুঁজিয়া পাইবার পূর্ব্বেই ফিরোজা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

সাহেবের বহুৎ মেহ্মান দোস্ত্ জমায়েৎ হইয়া বাংলোর বারান্দায় বসিয়া ছিল; সেইখানে ফিরোজার নাচ শুরু হইল, আমি গেটের বাহিরে টহল দিতে দিতে গরাদের ফাঁক দিয়া সব দেখিতে পাইতেছিলাম। যদিও মজ্লিশে লোকের ভিড় জমিয়াছিল, তবু আমার দৃষ্টি সকলকে ভেদ করিয়া যেন ফিরোজাকে দেখিতে পাইতে ছিল। আমি তাহার খঞ্জনীর ঝঞ্জনা শুনিতে পাইতে ছিলাম, তাহার সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ সুর শুনিতে পাইতেছিলাম, সে গাহিতেছিল—

ইশ্কৎ চুনান্ গোদাখ্ৎ তনম্-রা কে আব্ শুদ্,
গর্দী কে মানদ্ সুর্মা' চশ্ম্-ই-হুবাব্ শুদ্ !

তোমার প্রেমে এমন দ্রব তনু আমার আজ—
গলে' গলে' হয়েছে সে তরল যেন জল ;
ধূলা বালি অবশিষ্ট যাহা মনের মাঝ—
বুদ্বুদেরি চোখে তাহা হয়েছে কজ্জল !

আমি মাঝে মাঝে ফিরোজার ওড়্নার ও ঘাঘ্রার ঝলক ও ঝাপ্টা দেখিতে পাইতেছিলাম ; মাঝে মাঝে সে যখন নাচিতে নাচিতে তালের সমে বা ফাঁকে লাফাইয়া উঠিতেছিল, তখন তাহার মাথাও দেখিতে পাইতেছিলাম ; আবার মাঝে মাঝে সে যখন হাত মাথার উপর উঁচু করিয়া খঞ্জনীর সঙ্গে গাঁথা করতালে ঝঞ্চনা তুলিতেছিল তখন তাহার শুভ্র সুন্দর হাতখানি দেখিতে পাইতেছিলাম। শুনিতে পাইতেছিলাম সমবেত ফিরিঙ্গী-দের হাসি ও বাহবা দেওয়া, ফিরোজার রূপগুণের তারিফ করিয়া মস্করা রসিকতা। আমার মাথায় খুন চড়িতেছিল, মনে হইতে-ছিল, বুকের উপর সিনাবন্দে সারি করিয়া গাঁথা সব কয়টা টোটা হাতের বন্দুকটাতে ভরিয়া ঐ সব-কয়টা শয়তানকে একসঙ্গে জাহান্নমে পাঠাইয়া দি। ফিরোজা যে উহাদের রসিকতার উত্তরে কি বলিতেছিল তাহা বুঝিতে বা শুনিতে পাইতেছিলাম না বলিয়া রক্ষা ; সে উহাদের সঙ্গে রসিকতা করিতেছে জানিলে আমি আর নিজেকে সম্বরণ করিয়া রাখিতে পারিতাম না। আজ এই হিংসার তাড়নায় খুনের খেয়াল চার পাঁচ বার দমন করিতে হইল। আজ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম ঐ

সর্ব্বনাশের নেশা

শয়তানীকে আমি প্রাণ ঢালিয়া ভালোবাসিয়াছি—তাহাকে কেহ ভালোবাসে জানিলে খুন চাপিতেছে, এ ত প্রণয়েরই ধরণ!

ঝাড়া এক ঘণ্টা আমাকে এই নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল। তার পরে ইরাণী বেদেনী তয়ফাওয়ালীরা বাহির হইয়া আসিল। তাহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য সাহেবের গাড়ী আসিয়া দরজায় খাড়া হইল। ফিরোজা গাড়ীতে চড়িবার সময় তাহার অতুলন চোখ দুটি তুলিয়া আমার দিকে চাহিল—আপনি ত সে চোখের জাদুর পরিচয় পাইয়াছেন—সে চোখ দেখিয়াই বোধহয় কবি লিখিয়াছিলেন—

নজ্‌রে কুন্‌ ব-নর্‌গিস্‌ মখ্‌মুর।
কে ব-এক্‌বার মস্‌ৎ শুদ্‌ কে-মূল্‌॥

নজর করো অপরাজিতা মাতাল হল হায়—
এক্কেবারে মত্ত হল বেগর মদিরায়!

সেই বিনা শরাপে মাতোয়ালা চোখের দৃষ্টি হানিয়া সে গুনগুন করিয়া গান করিয়া উঠিল—

মুশ্‌ক্‌-বু-ইস্‌ৎ গুশা'-ই-গুল্‌জার্‌!
গুশা'-ই-জাহিদানা বাজ্‌ গুজার্‌!

কস্তুরী-বাস ঘনিয়েছে আজ ফুল-বাগানের কোণটিতে!
কুণো তোমার বাইরে যাবার ডাক এসেছে মনটিতে!

তাহার পর পাহাড়িয়া দুম্বার ছানার মতন লঘু ক্ষিপ্রপদে সে এক লাফে গাড়ীর ভিতরে লুকাইয়া পড়িল। কোচমান ঘোড়াকে চাবুক মারিল, এবং সেই স্ফূর্ত্তিবাজ শয়তানীদের লইয়া সে গাড়ী চলিয়া গেল—কি জানি সে কোথায়!

আমি পাহারার ডিউটি হইতে খালাস পাইবামাত্র বাসায় গিয়া সাফ-সুৎরা হইয়া আমার সর্ব্বোত্তম পোশাক পরিলাম—যেন আমি বিবাহ করিতে যাইতেছি। তাহার পর ফিরোজার সঙ্কেত অনুসারে সরকারী বাগানে ছুটিয়া গেলাম! সেখানে এক কোণে ফিরোজা বসিয়া ছিল।

আমাকে দেখিয়াই ফিরোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল—এই যে তুমি আসিয়াছ? চলো রাস্তায় বেড়াইতে বেড়াইতে কথা হইবে।

আমার কিছু বলিবার আগেই ফিরোজা মুখের উপর ওড়নার ঘোমটা টানিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল, আমিও চুম্বকে আকৃষ্ট লোহার মতন তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম।

পথে আসিয়া আমি বলিলাম—খানুম, বোধহয় তোমার কাছেই আমি একখানা রুটি উপহারের জন্য ঋণী ও কৃতজ্ঞ হইয়া আছি। রুটিখানা গর্ভবতী ছিল—তাহার দুই সন্তান আমার জেলখানার মধ্যে পয়দা হইয়াছিল; রুটিখানা আমি খাইয়া

ফেলিয়াছি, উখাখানা আমি তোমার স্মরণচিহ্ন স্বরূপ জেল হইতে আসিবার সময় জেলর-সাহেবের কাছ হইতে চাহিয়া আনিয়াছি—সেটাতে আমার বল্লমের ফলায় শাণ দেওয়া হয়; আর আশ্‌রফীটা এই তোমাকে নজর দিতে আনিয়াছি।

মিষ্ট শরবতের ঝর্ণাধারার মতন হাসিতে আমার মনপ্রাণ অভিষিক্ত করিয়া দিয়া ফিরোজা বলিয়া উঠিল—বাহবা কৃপণ! এ যে আজও পুঁজি জমাইয়া রাখিয়াছে! তা ভালো, আমার আজকাল টাকার বড় টানাটানি পড়িয়াছে, ক্ষুধাও লাগিয়াছে প্রচুর। চলো, তুমি আমাকে খাওয়াইবে।

আমরা শহরের বাজারের পথে চলিলাম। জিলাপী-গলিতে গিয়া এক সর্‌রাফের দোকানে ফিরোজা আশ্‌রফী ভাঙাইয়া লইল। তাহার পর এক মেওয়াওয়ালার দোকান হইতে নানাবিধ মেওয়া কিনিল; সেগুলি আমাকে রুমালে বাঁধিয়া বহিতে হুকুম করিয়া সে সওদা করিতে করিতে চলিল—নান-খাতাই, লাড্ডু, এক বোতল শরাপও। তাহার পর এক রুটিওয়ালার দোকানে গিয়া সে রুটি কাবাব সুরুয়া জুষ কত কি কিনিল—যেন সে দোকান উজাড় করিয়া সব কিনিয়া বৃহৎ ভোজের আয়োজন করিতে যাইতেছে! এই হরেক রকম খাদ্যের বোঝা বহিয়া আমি তাহার পিছন পিছন চলিলাম।

কিছু দূর গিয়া এই গলির একটা জীর্ণ ভগ্ন বাড়ীর সম্মুখে ফিরোজা থামিল ও দরজায় করাঘাত করিল। একটা ইরাণী বুড়ী—শয়তানের কৃতদাসী—দরজা খুলিয়া দিল। ফিরোজা

তাহাকে কি বলিল। বুড়ীটা প্রথমে একটু আপত্তি ও অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া ঘ্যানঘ্যান করিতেছিল; কিন্তু ফিরোজা বুড়ীটাকে কিছু মেওয়া কাবাব নান-খাতাই ও লাড্ডু বখ্‌শিশ করিয়া তাহাকে বশ করিয়া ফেলিল, তাহার পর ফিরোজা বুড়ীটার মাথায় তাহার ওড়্‌না চাপাইয়া দিয়া তাহাকে বাড়ী হইতে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিল এবং দরজায় খিল লাগাইয়া দিল। আমরা তুজনে ঘরে ঢুকিবামাত্রই ফিরোজা যেন খুশীর ফোয়ারার মতন নাচ গান শুরু করিয়া দিল —

তু ত মেরি দিল্‌পিয়ারা, তু ত মেরি জান্—
ইয়ার্ তেরা ইশ্‌ক্‌মে হুয়া ম্যয় হায়রান্!

আমি তুই হাতে খাবারের বোঝা ধরিয়া ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছি,—খাবারগুলা যে কোথায় রাখিব তাহাই ভাবি, না দানোয় পাওয়া ভূতাবিষ্ট ক্ষেপার মতন ফিরোজার নাচই দেখি। ফিরোজা হঠাৎ এক ঘুরপাক খাইয়া ঘরের এক কোণ হইতে বোঁ করিয়া আমার কাছে উপস্থিত হইল, এবং আমার হাত হইতে খাবারগুলা ছিনাইয়া ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া তুই হাতে আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আমার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল—তোমার ঋণ আমি আমার সর্ব্বস্ব দিয়া শোধ করিব, আমার সর্ব্বস্ব দিয়া শোধ করিব—বিল্‌কুল কর্জ্জ স্থদ সমেত শোধ করিব,—তুমি আমার স্বামী বন্ধু ইয়ার, আমি তোমার স্ত্রী, দিল্-আরাম!

আয়্ সাহেব! সেদিন—সেদিন—আমার জীবনের পরম দিন—সেদিনের কথা মনে হইলে আমি অতীত ভবিষ্যৎ সব ভুলিয়া যাই!

(ডাকাত মীর খাঁ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার চুরুটটা নিভিয়া গিয়াছিল, সেটা আবার ধরাইয়া লইয়া সে আবার বলিতে লাগিল—)

সমস্ত রাত্রি আমরা একসঙ্গে পরমানন্দে যাপন করিলাম। সে কচি খুকীর মতন মিষ্টান্ন খাইয়া ছড়াইয়া মাখিয়া যাচ্ছে-তাই কাণ্ড করিতে লাগিল। সে দড়ি দিয়া দরজায় জান্‌লায় জিলাপী টাঙাইয়া দিয়া বলিল—কাল সকালে মাছি আর ঘরে ঢুকিয়া আমাদের জালাতন করিবে না। সে বানরীর মতন বিবিধ কৌতুককর অঙ্গভঙ্গী দুষ্টামি রঙ্গ করিয়া আমাকে খুশীর দরিয়ায় ডুবাইয়া মারিবার উপক্রম করিল। আমি তাহার নাচ দেখিতে চাহিলাম। কিন্তু বাজনা কই? সে একবার ঘরের চারিদিকে তাহার চোখের চঞ্চল চাহনি বুলাইয়া বুড়ী বাড়ীওয়ালীর একখানা চীনামাটির সান্‌কী দেখিতে পাইল; সে দ্বিধা মাত্র না করিয়া এক আছাড়ে সেখানা ভাঙিয়া ফেলিল এবং তাহার দুটা বড় খণ্ড তুলিয়া পরস্পরে আঘাত করিয়া তাল দিয়া দিয়া নাচ শুরু করিল, আর মাঝে মাঝে গানও গাহিতে লাগিল—গানের একটা কলি আজও আমার মনে আছে—

আয়্ আশিক দূর মান্দা চুনী?
ওয়ি শামা আজ্ নূর মান্দা চুনী?

হে প্রণয়ী, বিরহ মোর কেমন তোমার লাগে ?—
শিখা-নেবা বাতির প্রাণে যেমন ব্যথা জাগে ?

এমন স্ফুর্ত্তিবাজ মেয়ের সঙ্গে সমস্ত জীবন নিমেষের মতন ফুঁকিয়া দেওয়া যায়, এক রাত্রির পরমায়ু সে কতক্ষণ! আমি আমাদের ছাউনিতে বিউগল্ বাজা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম যে ভোর হইয়া গিয়াছে; সিপাহীদের কাওয়াজের আওয়াজ বাজিতেছে।

আমি ফিরোজাকে বলিলাম—আয়্ মাহ্-রু (চন্দ্রমুখী), রাত্রি অবসান হইল, চন্দ্র অস্ত যাইবার সময় সমাগত, আমাকে এখন ছাউনীতে ফিরিতে হইবে—এখন সিপাহীদের নাম-ডাক হইবে।

ফিরোজা ঘৃণা তাচ্ছিল্যে মুখ কুঞ্চিত করিয়া রূঢ় স্বরে বলিয়া উঠিল—আয়্ গোলাম! চাবুক পিঠে পড়িবার ভয় আছে! চেহারা ও দিল্ দুইই তোমার দুম্বা ভেড়ার মতন!

আমি তাহার এই বিদ্রূপে আহত হইয়া একেবারে কাবু হইয়া পড়িলাম, আর নড়িবার শক্তি রহিল না। গর্হাজিরের জন্য যে শাস্তি তাহা ফিরোজার অসন্তোষের কাছে কিছুই নয়।

বেলা হইলে সে-ই এবার বিদায়ের কথা উত্থাপন করিল। সে বলিল—শুন দিল্-দার, আমি তোমার কর্জ্জ সুদ সমেত

শোধ করিয়াছি—নয় কি ? আমাদের রোক-শোধ হইয়া গেল —এখন বিদায় ! সেলাম আলেকম্ !

আমি তাহাকে আবার কখন্ কোথায় দেখিতে পাইব জিজ্ঞাসা করিলাম।

সে হাসিয়া উঠিয়া জবাব দিল—যখন তোমার মগজে একটু আক্কেল গজাইবে তখন।

তাহার পর সে একটু গম্ভীর হইয়া বলিল—তুমি কি বিশ্বাস করো দোস্ত্, আমি তোমাকে একটুখানি ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছি ? কিন্তু আমাদের মিলন টিকিবার নয়—আমি ফেরারী আসামী, তুমি পুলিস ; সাপে-নেউলে কুকুরে-শিয়ালে ঘর করা চলে না। তুমি আমার মত লক্ষীছাড়া সর্ব্বনাশা হইতে পারো ত আমি তোমার দিল্‌দার হইতে পারি খুশীতে। কিন্তু এ প্রস্তাব করা আহাম্মকী—তাহা হইবার নয়। যাও বাচ্চা, এক রাতের বাদ্‌শাহী বখ্‌শিশ তোমার মিলিয়া গিয়াছে, শয়তানের সঙ্গে—হাঁ শয়তানের সঙ্গেই—এক রাতের হমদমী দোস্তী হইয়া গিয়াছে। শয়তান সব সময় কালো হয় না, আর পুরুষও হয় না—সে মাঝে মাঝে সুন্দরী নারীমূর্ত্তিতেও দেখা দেয় ! আমার দেহ পশমী পোষাকে আচ্ছাদিত, কিন্তু তাই বলিয়া আমি নিরীহ ভেড়া নই। যাও দোস্ত্, এইবার তোবা করো গিয়া মোল্লার কাছে, দর্‌গায় ফয়তা দাও গিয়া, মস্‌জিদে মাথা কুটিয়া সিজ্‌দা করো গিয়া, তোমার গুনাহ্ কাটিয়া যাইবে। এস, আবার তোমাকে বিদায় দি,—বিদায় বন্ধু

চিরবিদায়। ফিরোজার কথা আর কখনো মনে করিয়ো না—তাহাকে চাহিলে কাঠের পা-ওয়ালা বিধবার বরণমাল্য গলায় পরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিতে হইবে।

কাঠের পাওয়ালা বিধবা মানে ফাঁশীকাঠ, দড়ির ফাঁশী লইয়া যাহার গলায় বরণমাল্য পরায় তাহারই সে বিধবা স্ত্রী হয়।

ফিরোজা দরজার হুড়্‌কা খুলিয়া ফেলিল, পথে নামিবার আগে ওড়্‌নায় মুখ ঢাকিয়া সে আমার সঙ্গে সঙ্গে পথে আসিল। এবং হঠাৎ তাহার কুরঙ্গগতিতে ছোট্ট ছোট্ট পা-দুখানি শাদা পাখীর ডানার মতন উড়াইয়া কোথায় উধাও হইয়া গেল।

ফিরোজা আমাকে সত্য ও সৎ উপদেশই দিয়াছিল। তাহাকে ভুলিয়া গেলেই আমার বুদ্ধিমানের কাজ হইত; কিন্তু সেই এক রাত্রি তাহার সঙ্গে যাপন করিয়া আমি একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম—ফিরোজা ছাড়া আমার আর কোনো চিন্তা ছিল না। আমি নিশিতে-পাওয়া রোগীর মতন পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতাম কোথাও তাহাকে একটি বার যদি দেখিতে পাই। আমি সেই বাড়ীওয়ালীর কাছে আর তাহার পরিচিত আলাপী দোকানদারদের কাছে তাহার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলাম; সকলেই বলিল সে ইরাণে চলিয়া গিয়াছে। বোধ হয় উহারা সকলেই ফিরোজার শিক্ষা-মতো আমাকে মিথ্যা কথা বলিল—কারণ তাহাদের মিথ্যা ধরা পড়িতে বেশী দেরী হইল না।

কয়েক সপ্তাহ পরে আমি চুঙ্গীঘরের কাছে পাহারায় নিযুক্ত

ছিলাম। খাইবার-পাস হইতে শহরে ঢুকিবার মুখে ঘাটী আগ্‌লাইয়া আছে চুঙ্গীঘর—যে-সব সওদাগর যায় ও আসে তাহাদের মাল দেখিয়া চুঙ্গী মাশুল আদায় করা হয়। কেহ চুরি করিয়া যাওয়া আসা করিতে না পারে এজন্য শহরের চারিদিক্ দেওয়াল দিয়া ঘেরা—মাঝে মাঝে ফটক আছে, সেখানে দিনে রাতে পাহারা থাকে, কোনো কোনো ফটক আবার রাতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। শহর-ঘেরা দেওয়ালের এক জায়গা ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, সেখানটা মেরামত হইতেছিল; সেই ফাঁক আগ্‌লাইবার ভার ছিল আমার উপর। আমি দেখিলাম,—যে বাড়ীতে ফিরোজার সহিত আমি রাত্রি-যাপন করিয়াছিলাম সেই বাড়ীওয়ালী বুড়ীটা খুব ব্যস্ত হইয়া আমার অপর সঙ্গী সিপাহীদের সঙ্গে কি কথা কহিতেছে এবং চুঙ্গী-ঘরের চারিপাশে ঘুরঘুর করিতেছে। সে কিছুক্ষণ পরে আমার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল আমি ফিরোজার কোনো কিছু খবর পাইয়াছি কি না।

আমি একটু ব্যগ্র হইয়া বলিলাম—না।

সে বলিল—শীঘ্রই পাইবে, চিন্তা নাই।

সে সত্য কথাই বলিয়াছিল। রাত্রে আমি যখন সেই ভাঙা ফুকোর আগ্‌লাইতে নিযুক্ত ছিলাম,—তখন আমাদের অফি-সার সাহেব সরিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখিলাম একটি রমণী আমার দিকে আসিতেছে। আমার দিল্ বলিয়া দিল যে সে ফিরোজা! তথাপি আমি সৈনিক, সিপাহীর কর্ত্তব্যের

খাইবার-গিরি-পথের দৃশ্য

খাইবার-গিরিপথে সার্থবাহদল

খাতিরে ডাক দিলাম—হু-কুম-দার (who comes there)? বেরো গুম্ শো (এখান হইতে দূর হও)!

ফিরোজা তাহার ঘোমটা খুলিয়া তাহার সুন্দর মুখখান দৃপ্তভঙ্গীতে কাত করিয়া বলিল—বাস্ কুন্ আজিজ-ই-মন্ (চুপ করো প্রিয় আমার)! বোকার মতন চেঁচাইও না।

আমি স্থান কাল কর্ত্তব্য ভুলিয়া উল্লসিত স্বরে বলিয়া উঠিলাম—চেহ্ খুশ্‌বখ্‌ৎ! বেসিয়ার খুব! (কী পরম সৌভাগ্য)! তুমি ফিরোজা, তুমি!

ফিরোজা তাহার স্বরে স্বর্গের সুধা মিশাইয়া আমার সকল অবশ ইন্দ্রিয়কে পান করাইয়া মাতাল করিয়া দিল—হাঁ বন্ধু, হাঁ প্রিয়তম, তোমার সঙ্গে আমার গোপন কথা আছে।

আমার চেতনা শিথিল হইয়া আসিল—না জানি সে কোন্ বেহেশ্‌তে বিহার করিবার গোপন নিমন্ত্রণ বহন করিয়া ফিরোজা আমার সন্ধানে আসিয়াছে। আমার সর্ব্বেন্দ্রিয়কে শ্রবণে পরিণত করিয়া আমি স্তব্ধ হইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

সে বলিল—কিছু রোজ্‌গার করিবে ইয়ার? এক কাফেলা সওদাগর তাহাদের তেজারতী মাল লইয়া এই পথে শহরে ঢুকিবে—তুমি তাহাদের ছাড়িয়া দিবে।

আমি শক্ত হইয়া বলিলাম—না। আমি তাহাদিগকে বাধা দিব। এ পথে কাহাকেও আসিতে যাইতে দিবার হুকুম নাই।

ফিরোজা আবার সেই সেদিনের মতন পরম ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যে নাক মুখ চোখ বক্র করিয়া বলিয়া উঠিল—হুকুম! হুকুম! হুকুম! হুকুমের বান্দা! হুকুমের গোলাম! এমন কর্ত্তব্যজ্ঞান সেদিন রাত্রে জিলেপী-গলিতে কোথায় ছিল?

সেই নিশার নেশার স্মৃতি জাগাইয়া দিয়া ফিরোজা আমাকে বিবশ করিয়া দিল, আমি যেন বিকারগ্রস্তের প্রলাপ বকার মতন বলিলাম—আ! সেদিন যে আনন্দ পাইয়াছিলাম তাহার জন্য দুনিয়া বিসর্জ্জন দেওয়া যায়। আমি টাকা ঘুষ চাই না।

ফিরোজা চোখের চঞ্চল চাহনিতে দুষ্টামি-ভরা হাসি চম্‌কাইয়া বলিল—আচ্ছা, তবে আর-এক রাত সেই বাড়ীতে যাপন করিবার সুবিধা পাইলে কেমন হয়?

উঃ! এ যে আশাতীত, সংনাতীত! তবু আমি সেই পরম লোভ সম্বরণের চেষ্টায় একেবারে বেদম হইয়া বলিয়া ফেলিলাম—না, সে সুবিধা পাইলেও আমি চুরির সাজুষ হইতে পারিব না। ঈ না-মুম্‌কিন্ আস্‌ৎ (ইহা অসম্ভব ও অনুচিত)।

ফিরোজা ঠোঁট বাঁকাইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—বেসিয়ার খুব (বহুৎ আচ্ছা)! যদি তুমি এমনই কঠিন কর্ত্তব্যপরায়ণ, তবে তুমি যার হুকুমের গোলাম তাহাকে দিয়াই তোমাকে হুকুম করাইব। তোমার অফিসার কর্ণেল-সাহেব সুন্দরীর অনুরোধের কদর জানে—তাহাকেই তবে জিলেপী-গলিতে নিমন্ত্রণ করিব। তাহাকে দিয়া এমন লোককে এখানে

পাহারা রাখাইব যে ফিরোজা-বিবির হুকুমের চেয়ে আর কাহারো হুকুমকে বড় মনে করে না। খুদা হাফিজ্ দোস্ত্! যখন তোমার ফাঁসীর হুকুম হইবে সেদিন আবার দেখা হইবে—আমি তোমার বিবাহ-সভায় হাসিতে আসিব।

ফিরোজা ঘাঘ্রা ঘুরাইয়া কোমর দুলাইয়া ওঢ়্না উড়াইয়া চলিয়া যাইতেছিল; আমি দুর্ব্বল, আমি তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইলাম। সে যদি আমার অভিলষিত বখ্শিশ দিয়া আমাকে পুরস্কৃত করে তবে আমি চোরাই মালের সওদাগরদের পথ ছাড়িয়া দিব স্বীকার করিলাম। সে খোদা-কশম কবুল হইল যে কাল সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে তাহার আবার মিলন ঘটিবে এবং সে লঘুপদে ছুটিয়া তাহার দলের লোকদের খবর দিতে গেল। তাহারা নিকটেই ছিল; তাহারা পাঁচ জন, সকলের সঙ্গেই খচ্চর-বোঝাই ইরাণী মাল। ফিরোজা দূরে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতে লাগিল—যদি সে অন্য সিপাহী আসিতে দেখে তবে গান গাহিয়া সতর্ক করিয়া দিবে কথা রহিল। কিন্তু সে রাত্রে তাহার সুকণ্ঠের গান শুনিবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য আমার হয় নাই—অন্য কোনো সিপাহী এদিকে তখন আসে নাই। চোর সওদাগরেরা খুব জল্দি কাজ হাসিল করিয়া শহরে ঢুকিয়া পড়িল।

পরদিন সন্ধ্যাকালে আমি জিলেপী-গলিতে গেলাম। ফিরোজা একা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্তু প্রসন্ন মনে খুশ্-মেজাজে নহে। আমাকে দেখিয়াই সে বলিয়া উঠিল

—যে লোককে খোসামোদ করিয়া কথা শুনাইতে হয় তাহার তোয়াক্কা আমি রাখি না। প্রথম বারে তুমি প্রতিদানের কোনো প্রত্যাশা না করিয়াই আমার উপকার করিয়াছিলে; এবার বাণিয়া-বৃত্তিতে লাভের আশায় দর-কষাকষি? আমি জানি না যে কেন আমি আজ এখানে আসিয়াছি, তোমার টানে আসি নাই এ নিশ্চিত; বোধ হয় এই কথাটাই তোমায় বলিতে আসিয়াছি যে তোমার প্রতি আমার মনে একটুও টান আর নাই। অতএব তুমি চলিয়া যাও। তোমার কাজের মেহনতানা মজুরী এই লও একটা আশ্‌রফী।

সে আমার গায়ে একটা আশ্‌রফী ফেলিয়া দিল—সেই আশ্‌রফীটা যেন বন্দুকের গুলির মতন, জ্বলন্ত অঙ্গারের মত আসিয়া আমার গায়ে লাগিল। আমার ইচ্ছা করিল এই আশ্‌রফীটা ফিরাইয়া তাহার মাথায় মারি; কিন্তু প্রবল চেষ্টায় তাহাকে মারিবার দুর্দ্দম আগ্রহ দমন করিলাম। এক ঘণ্টা বকাবকি তর্কাতর্কি করিয়াও তাহাকে নরম করিতে না পারিয়া আমি ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হইয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম। সমস্ত রাত পাগলের মতন সারা শহরের গলিতে গলিতে ঘুরিয়া বেড়াইলাম। ভোর বেলা মুয়াজ্জিনের নমাজের ডাক শুনিয়া আমার চৈতন্য হইল, আমি মস্‌জিদে নমাজ করিতে গেলাম। মস্‌জিদের এক অন্ধকার কোণে বসিয়া একলা নমাজ পড়িতে পড়িতে আল্লার কাছে আমার বেদনা চোখের জলে নিবেদন করিয়া দিতে লাগিলাম।

হঠাৎ একেবারে খুব কাছে কাহার স্বর শুনিলাম—আ রে! বীর সিপাহীর চোখের জল! একটুখানি পাইলে আমি বশীকরণের ঔষধ তৈয়ারি করিতাম!

আমি মুখ তুলিয়া অশ্রুজলে ঝাপ্‌সা দৃষ্টিতে দেখিলাম আমার পাশে ফিরোজা দাঁড়াইয়া আছে।

আমার অশ্রু বোধ হয় সঙ্গ্‌-দিল্ পাষাণীর চিত্ত ভিজাইয়া নরম করিয়াছিল। সে বলিল—আয়্ দিল্‌দার, তুমি আমার জন্য কাঁদিতেছ? আমিও সন্দেহ করিতেছি যে তোমার উপর ভালোবাসার টান এখনো আমার মনে একটু আছে; নহিলে দেখ না, তুমি চলিয়া আসিলে আমি ঠিক করিতেই পারিতেছিলাম না যে আমাকে লইয়া আমি কি করিব, তাই তোমাকে খুঁজিতে আসিয়াছি। তুমি দেখিতেছ, আমি সাধিয়া ডাকিতে আসিয়াছি, আমি হার মানিয়াছি, তোমাকে জিলেপী-গলির সেই বাড়ীতে লইয়া যাইতে চাই।

আমাদের ঝগ্‌ড়া তৎক্ষণাৎ মিটমাট হইয়া গেল। কিন্তু ফিরোজার মেজাজ যেন বর্ষাকালের আকাশ—এই রৌদ্র, এই মেঘ, এই বজ্র, এই বর্ষণ। যখন বেশ রৌদ্র, তখনই আবার কোথা হইতে আসিয়া জুটে ঘনঘটা ঝঞ্ঝা ঝঞ্ঝনা! আমি সন্ধ্যাবেলা সেই বাড়ীতে গেলাম, কিন্তু ফিরোজা সেখানে নাই; বাড়ীওয়ালী বুড়ী দিব্য প্রশান্ত ভাবে বলিল—ফিরোজা সওদাগরী কাজে কাবুলে গিয়াছে।

বাড়ীওয়ালী বুড়ীর কথায় বিশ্বাস না করাই যে উচিত

তাহা আমার পূর্ব্ব অভিজ্ঞতায় জানা ছিল, কাজেই যেখানে যেখানে ফিরোজার দেখা পাওয়া সম্ভব সেইসব জায়গায় আমি বার বার হাঁটাহাঁটি করিতে লাগিলাম। একদিন সন্ধ্যাবেলা আমি বুড়ীর বাড়ীতে বসিয়া ছিলাম—আমি বুড়ীকে বকশিশ দিয়া বশ করিয়াছিলাম—এমন সময় ফিরোজা আসিল, সঙ্গে তাহার এক যুবক ইংরেজ, আমারই পল্টনের লেফ্টেনেণ্ট্।

ফিরোজা ইরাণী ভাষায় বিরক্ত স্বরে বলিয়া উঠিল—বেরো গুম্ শো! বেরো শো! (চলিয়া যাও, এখান হইতে চলিয়া যাও।)

ইংরেজটা বলিয়া উঠিল—তোম্ ইঁহা পর ক্যা করতা হ্যায়?—নিকালো, ইঁহা-সে নিকালো!

আমি যেন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম; আমার যেন অঙ্গচালনার শক্তি তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। আমি নড়িলাম না। অন্তরে আমার ক্রোধ যেন টগবগ করিয়া ফুটিতেছিল।

ইংরেজটা যখন দেখিল আমি নড়িলাম না, এবং তাহাকে সেলামও করিলাম না, তখন সে আমার গর্দ্দানা ধরিয়া আমাকে জোরে ধাক্কা দিল। আমি জানি না তাহার জবাবে আমি তাহাকে কি বলিয়াছিলাম—এখন কিছু মনে নাই। ইংরেজটা চট্ করিয়া তাহার তরোয়াল্ খুলিয়া ফেলিল; আমিও আমার তরোয়াল খুলিয়া খাড়া হইলাম্। হঠাৎ বুড়ীটা আসিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিল এবং ইংরেজটা আমার কপালে তরোয়ালের

চোট্ মারিল ; আমি চট করিয়া মাথা সাম্‌নের দিকে ঝুঁকাইয়া দিয়া পাগড়ীর উপরেই সেই আঘাত লইলাম, নতুবা আমার মুখটা দু-ফাঁক হইয়া চিরিয়া যাইত ! কপালের খানিকটা কাটিয়া গেল—তাহার দাগ এখনো কপালে আছে—ফিরোজাকে ভালো-বাসিয়া এই হইল আমার ললাট-লেখা ! আমি এক পা পিছে হটিয়া এক ঝট্‌কায় বুড়ীকে ছিট্‌কাইয়া ঘরের সুদূর কোণে গড়াইয়া পাঠাইয়া দিলাম। তাহার পর ইংরেজের আক্রমণের জন্য তৈয়ার হইয়া দাঁড়াইলাম—সে আমাকে আক্রমণ করিবা মাত্র আমি আমার তরোয়ালের নখ তাহার বুকে বিদ্ধ করিয়া দিলাম, সে রক্তের ঝলকে আমার তরোয়ালকে রঞ্জিত করিয়া পড়িয়া গেল। ফিরোজা তৎক্ষণাৎ ঘরের আলো নিবাইয়া দিয়া বুড়ীকে পালাইতে বলিল। আমি সেই কথা শুনিয়া ছুটিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম। এবং যেদিকে-সেদিকে দৌড়িয়া চলিতে লাগি-লাম। কিছুদূর গিয়া মনে হইল কেউ আমার অনুসরণ করি-তেছে। যখন আমি প্রকৃতিস্থ হইয়া বুঝিবার মতন অবস্থা ফিরিয়া পাইলাম, তখন দেখিলাম ফিরোজা আমার পাশে ! সে আমাকে ত্যাগ করে নাই !

সে আমাকে থামিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—আয় বে-আক্কেল চিড়িয়া, তুমি খালি অনর্থ ঘটাইতে পটু ! দেখিতেছ ত আমি সত্য কথা বলিয়াছিলাম যে আমাকে চাহিলে তোমার দুঃখ ঝঞ্ঝাটই বাড়িবে। যাক, গতস্য শোচনা নাস্তি, পেটে খাইতে পাইলে পিঠে সহিবে—দুঃখ অসহ্য হইবে না যদি ইরাণী রমণীকে

প্রণয়িনী পাও। সকল দরদেরই দাবাই আছে। আচ্ছা, এখন পহেলা ত মাথার দরদে দাবাই লাগাও—এই রুমালখানা দিয়া কপালের কাটা জায়গাটা বাঁধিয়া ফেলো, আর তোমার তরোয়ালের খাপ সমেত কোমরবন্দটা আমায় খুলিয়া দাও ত। এইখানে আমার জন্য একটু অপেক্ষা কর, আমি দু মিনিটের মধ্যে ফিরিয়া আসিতেছি।

সে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল এবং শীঘ্রই আবার ফিরিয়া আসিল; আমার জন্য একটা বড় আল্‌খাল্লা লইয়া আসিয়াছে—কোথা হইতে সংগ্রহ করিল কি জানি। সে আমার সিপাহীর পোশাক খুলাইয়া আমায় সেই আল্‌খাল্লা পরাইল। এই লম্বা আল্‌খাল্লা পরিয়া আমার চেহারা বদল হইয়া গেল, যেন আফ্রিদি চাষা। তখন সে আমাকে সেই বুড়ীর বাড়ীর মতন আর-একটা বাড়ীতে লইয়া গেল। সেখানে ফিরোজা ও অপর একজন ইরাণী বেদেনী মিলিয়া আমার কপালের মুখের রক্ত ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া দিল, তাহাতে কি সব দাবাই প্রলেপ লাগাইয়া দিল—এমন ডাক্তারী ফৌজী ডাক্তারও করিতে পারিত না। এবং আমাকে একটা কি দাবাই খাইতে দিল। তাহার পর আমাকে একটা বিছানায় শোওয়াইয়া দিল। আমি শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

আমার পানীয় দাবাইএর মধ্যে উহারা কিছু ঘুমের দাবাই মিশাইয়া দিয়াছিল, কারণ পরদিন বিকাল-বেলার আগে আমার ঘুম ভাঙিল না। ঘুম ভাঙিলে দেখিলাম আমার ভয়ানক মাথা ধরিয়াছে এবং একটু জ্বরভাব হইয়াছে। কেমন করিয়া যে পীড়িত

হইলাম ও এখানে আসিলাম তাহা স্মরণ করিতেও আমার অনেকক্ষণ সময় লাগিল।

ফিরোজা আসিয়া আমার মাথার পটী খুলিয়া ক্ষত ধুয়াইয়া পরিষ্কার করিল এবং আবার ঔষধ লেপিয়া বাঁধিয়া দিল। তাহার পর দুজন স্ত্রীলোকই আমার বিছানার পাশে বসিয়া কি কথা বলাবলি করিল—আমার চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পরামর্শ বলিয়া মনে হইল। তাহারা উভয়েই আমাকে আশ্বাস দিল যে আমি শীঘ্রই আরাম হইয়া উঠিব; কিন্তু আরোগ্য হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলে চলিবে না, ইংরেজের মুলুক ছাড়িয়া পালাইতে হইবে, নতুবা ধরা পড়িলে উহারা আমাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিবে।

ফিরোজা আমাকে বলিল—শুনো ইয়ার, তোমায় ত রোজ্‌গারের একটা পথ ধরিতেই হইবে—ইংরেজ-সরকার ত আর নিমক খাওয়াইবে না, এখন নিজের দানা-পানীর ব্যবস্থা নিজেই করিতে হইবে। তুমি এমন আহাম্মক বে-আক্কেল যে রাহাজানি ব্যবসা তুমি চালাইতে পারিবে না—যদিও তুমি জোরালো জোয়ান ও সাহসী বীর। তুমি এখন চোরাই মাল আম্‌দানী রপ্তানী শুরু করো। আমি ত তোমাকে বলিয়াছিলামই যে আমি তোমাকে ফাঁশী দেওয়াইব। তবে গুলি খাওয়ার চেয়ে ফাঁশী যাওয়া বোধ হয় ভালো। তুমি একটু হুশিয়ার হইয়া চুঙ্গী-পুলিশের হাত এড়াইয়া চলিতে পারিলে রাজার হালে থাকিতে পারিবে।

এইরূপ দিল্‌খুশী কথায় সেই সুন্দরী প্রেয়সী শয়তানী আমায়

এক নূতন অদৃষ্ট-পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিল। বাস্তবিক কথা বলিতে কি, তখন এই এক পথই আমার কাছে খোলা ছিল—হয় চুরি করিয়া বাঁচিতে হইবে, নয়ত মৃত্যুদণ্ড স্বীকার করিতে হইবে। হইল ভালো—ফেরারী ফিরোজার সহিত ফেরারী আমার অদৃষ্ট এক হইয়া গেল। আপনাকে বোধ হয় খুলিয়া বলার দরকার হইবে না সাহেব, যে, ফিরোজা সহজেই আমাকে তাহার প্রস্তাবে সম্মত করাইতে পারিয়াছিল। এই বে-আইনী অন্যায় আচরণের সঙ্কট ও সদা-আশঙ্কার বন্ধনে আমরা দুজনে ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিব—এই আনন্দে অকরণীয় কাজও আমার বরণীয় বোধ হইয়াছিল। সেইদিন হইতে আমার দৃঢ় ধারণা হইল যে ফিরোজার প্রণয়ে আমার অধিকার প্রাণের দাবীতে কায়েমী হইয়া গেল। আমি চোরাই মালের সওদাগরদের গল্প অনেক শুনিয়াছিলাম—তাহারা পাহাড়িয়া চোরা পথে চলাফেরা করে, তাহারা ঘোড়ায় উটে চড়িয়া মাল চালান করে, তাহাদের সঙ্গে থাকে বড় বড় বন্দুক ও তরুণী রমণী। আমি কল্পনার ছবিতে দেখিতে লাগিলাম—আমার কোলের কাছে এই সুন্দরী ইরাণী তরুণীকে বসাইয়া উটে সওয়ার হইয়া পাহাড়ের অলিগলি দিয়া আনাগোনা করিতেছি। আমি যখন ফিরোজাকে আমার এই সুখ-কল্পনা প্রকাশ করিয়া বলিলাম, তখন তাহার হাসির ফোয়ারা উৎসারিত হইয়া উঠিল—হাসি হাসি হাসি, ক্রমাগত হাসি—হাসিতে হাসিতে সে দুইহাতে পেট চাপিয়া বসিয়া পড়িয়া লুটাইতে

লাগিল। খানিক পরে সে দম লইয়া চোখের জল মুছিয়া বলিল —উঃ এ সুখ অতুলন নিরুপম! কাফেলার সঙ্গে যাইতে যাইতে সন্ধ্যাকালে ছাউনি গাড়িয়া ঘরকন্না পাতা, আর একটা খুঁটির তিনদিকে তিনটা দড়ির টানা দিয়া তাহার উপর একখানা কম্বল জড়াইয়া ছোল্‌দার তাঁবু বানাইয়া স্বামী-স্ত্রীতে তাহার মধ্যে গুটিসুটি হইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া রাত্রিযাপন—তেমন সুখ বাদ্‌শাহের দৌলতখানায় নাই, বেহেশ্‌তের গুল্‌জারে নাই।

আমি বলিলাম—তোমাকে লইয়া পাহাড়ে আমি সুখে বিচরণ করিব—লোকালয়ের বাহিরে আমি নিশ্চিন্ত থাকিব—সেখানে কোনো ইংরেজ লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ আমার নিকট হইতে তোমার হিস্‌সা চাহিতে আসিবে না।

ফিরোজা বলিল—আরে! তোমার আবার হিংসা আছে দেখিতেছি—তোমার কপালে অনেক দুঃখভোগ আছে। এমন আহাম্মক তুমি! তুমি কি বুঝিতে পারো না যে আমি তোমাকে ভালোবাসি—আমি তোমার কাছে কখনো পয়সার প্রত্যাশা করি নাই।

তাহার এই রকম কথা শুনিয়া আমার মনে দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা হইতে লাগিল যে তাহার টুঁটি টিপিয়া একেবারে কণ্ঠরোধ করিয়া দি।

যাক সে কথা, বিস্তারিত বলিয়া আপনাকে বিরক্ত করিব না সাহেব—সংক্ষেপেই বলি। ফিরোজা আমাকে একটা পাহাড়িয়া পোশাক সংগ্রহ করিয়া দিল; আমি সেই ছদ্মবেশে

সর্ব্বনাশের নেশা

ইংরেজের মুলুকের সীমানা পার হইয়া পালাইলাম। আমি ফিরোজার এক সুপারিশ-পত্র লইয়া মাশুদে গেলাম; সেখানে চোরাই মালের সওদাগর কাফেলার সর্দ্দার, ঘলিওয়াজ খাঁ, আমাকে তাহাদের দলভুক্ত করিয়া লইল। আমরা মাশুদ হইতে সরাই-কেল্লাতে গেলাম—সেখানে ফিরোজা আসিয়া আমার সঙ্গে মিলিবে কথা ছিল, সেখানে তাহার দেখা পাইলাম—সে তাহার কথা রাখিয়াছে। আমরা ইংরেজ-মুলুকের সীমানায় সীমানায় চলিতে লাগিলাম—এবং ঘাটীতে ঘাটীতে চোরাই মালের খরিদ বিক্রী চলিতে লাগিল। আমরা এ দেশের জিনিস সংগ্রহ করিয়া চুরি করিয়া ইংরেজ-সীমানা পার করিয়া দি; এবং ইংরেজ-সীমানার কতকগুলা সওদাগর সে দেশের জিনিস চুরি করিয়া আমাদের বেচিয়া যায়—এই লেনা-দেনায় কেবল চুঙ্গী মাশুল ফাঁকি দিয়া ব্যবসা করাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। এই ব্যাপারে ফিরোজা গোয়েন্দার কাজ করিত—এমন খবরগীর গোয়েন্দার কাজ আর কেহ করিতে পারে কি না সন্দেহ। আমরা এক ইংরেজ সওদাগরের মারফতে অনেক বিলাতী মাল সংগ্রহ করিলাম এবং কতক মাল পাহাড়ের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া বাকী মাল লইয়া আমরা সীমানায় সীমানায় ফাঁকির ব্যবসা করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম; এবং সেই মাল ফুরাইয়া গেলে আবার লুকানো মাল বাহির করিয়া ব্যবসা চালাইতে লাগিলাম। ফিরোজা তাহার রূপে ও চাতুরীতে ইংরেজ কর্ম্মচারীদের ভুলাইয়া বোকা বানাইয়া রাখিত, সেই সুযোগে আমরা ইংরেজের মুলুকের

মধ্যে ঢুকিয়া কাজ হাসিল করিতাম। ফিরোজা আমাদিগকে খবর জোগাইত কখন কোথা দিয়া কেমন করিয়া আমরা ইংরেজ-মুলুকে প্রবেশ করিব বা তথা হইতে পলায়ন করিব। এইরূপে কয়েকবার নির্ব্বিঘ্নে যাওয়া আসা করিলাম। এই সদা-শশঙ্ক উত্তেজনাপূর্ণ চোরাই সওদাগরী আমার কাছে সিপাহীর এক-ঘেয়ে কাজ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মনোহর মনে হইতে লাগিল। আমি প্রচুর টাকা রোজগার করিতে লাগিলাম, ফিরোজাকে পাইয়া-ছিলাম, আমার আর কোনো আফশোষ ছিল না। আমরা সর্ব্বত্রই সমাদৃত হইতেছিলাম; আমার সঙ্গীরা আমাকে বেশ খাতির করিয়া চলিত।—কারণ আমি একজন ইংরেজকে খুন করিয়াছিলাম, এমন সৌভাগ্য আমার সঙ্গীদের মধ্যে আর কাহারও হয় নাই। ফিরোজা আমার প্রতি আজকাল খুব বেশী দরদ ও টান দেখাইত, কিন্তু তাহার সঙ্গে আমার যে দোস্তী ভিন্ন অন্য সম্পর্ক আছে তাহা কাহারও কাছে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করিতে সে আমাকে বারণ করিয়া দিয়াছিল। এই খেয়ালী প্রাণীটির কাছে আমি এমন দুর্ব্বল হইয়া থাকিতাম, যে, সে যাহা হুকুম করিত তাহাই বে-ওজর তামিল করিতাম। সে আজকাল সতী রমণীর ন্যায় সংযত হইয়া থাকিত। আমি মূঢ়, তাই মনে করিতাম সে বোধ হয় তাহার পূর্ব্ব স্বভাব ত্যাগ করিয়া সাধ্বী হইয়াছে।

আমাদের দলে আট-দশজন লোক ছিল; বিশেষ দর্‌কারী ব্যাপারে আমরা সকলে একত্র সম্মিলিত হইতাম, নতুবা

সাধারণতঃ আমরা জোড়ায় জোড়ায় বা তিন তিন জন করিয়া গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে ছড়াইয়া থাকিতাম। আমাদের প্রত্যেকেই লোক-দেখানো এক-একটা ব্যবসা অবলম্বন করিয়া থাকিতাম—কেহ বা ফেরিওয়ালা হইয়া ফিরিতাম, কেহ বা ঘোড়া বিক্রী করিতাম, কেহ বা সলুত্রী বা অশ্ব-চিকিৎসক হইতাম, কেহ বা হকিম সাজিয়া নানা রোগের ঔষধ বিতরণ করিতাম। আমি প্রায়ই ফেরিওয়ালা হইয়া ফিরিতাম, কিন্তু কদাচিৎ বড় শহরে যাইতাম, কারণ আমার নামে ইংরেজ খুন করার জন্য গেরেপ্তারী পরোয়ানা ও হুলিয়া বাহির হইয়াছিল।

একদিন—অর্থাৎ এক রাত্রে—সফেদ কোহ্ পাহাড়ের তলে কুরম নদীর ধারে থল নামক একটা ছোট শহরে আফ্গানিস্তান ও ইংরেজ-মুলুকের সীমানায় আমাদের দলের সর্দ্দার ঘলিওয়াজ খাঁ ও আমি অপর সকলের আগে সঙ্কেত-স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ঘলিওয়াজ খাঁকে খুব খুশী দেখিলাম। সে আমাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল—আমরা শীঘ্রই আর-একজন হম্‌কুন্ (সহকর্ম্মী) পাইব। ফিরোজা বহুৎ চালাকী ও কৌশলের পরিচয় দিয়াছে—সে তাহার স্বামীকে কোহাট জেলখানা হইতে খালাস করিয়া পালাইবার উপায় করিয়া দিয়াছে।

এইসব পাহাড়িয়া ডাকাতদের ভাষা আমি অল্প অল্প বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। তাহার মুখে এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন শীতে আড়ষ্ট হিম হইয়া গেল। আমি বলিয়া উঠিলাম—ফিরোজার স্বামী? তাহার কি স্বামী আছে?

মীর খাঁ ডাকাত ও ফিরোজার স্বামী বাজ খাঁ

সর্দ্দার বলিল—আছে বৈ কি ? এক চোখ কাণা বুড়া বাজ খাঁ—ফিরোজার মতন সেও ইরাণী বেদে। বেচারা যাবজ্জীবন কয়েদ থাকিবার দণ্ডভোগ করিতেছিল। ফিরোজা জেলখানার জেলর ও ডাক্তার সাহেবদের এমন জাদু করিয়া বশ করিয়াছিল যে তাহার স্বামীর পালাইবার আর কোনো বাধা ছিল না। আ! ঐ মেয়েটি অমূল্য—উহার ওজন-সমান আশ্‌রফী দিলেও উহার মূল্য দেওয়া হয় না। দুই বৎসর ধরিয়া ফিরোজা তাহার স্বামীকে খালাস করিবে চেষ্টা করিতেছিল; আগের জেলর বদল হইয়া যাওয়ায় এতদিনে নয়া জেলরকে দিয়া সে কাজ হাসিল করিতে পারিয়াছে—এ আদ্‌মী ফিরোজার কদর বুঝিয়া তাহার খাতির রাখিয়াছে।

আপনি সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন এইসব অশ্রাব্য খবর আমি কিরূপ আনন্দের সহিত শুনিতেছিলাম।

শীঘ্রই আমার সঙ্গে একচোখো বাজ খাঁর মূলাকাত ঘটিল। জননী বসুন্ধরা যত শয়তান বদ্‌মায়েস প্রসব করিয়াছেন তাহাদের সর্দ্দার বোধ হয় এই লোকটা—অন্ততঃ অমন বে-আদব বদ্‌মায়েস আমি জীবনে কখনো দেখি নাই। সে বাজ-পাখীর মতন নিষ্ঠুর ধূর্ত্ত হিংস্র! ফিরোজা তাহার স্বামীর সঙ্গেই আসিয়াছিল এবং আমাকে শুনাইয়া শুনাইয়া তাহাকে শওহর্ (স্বামী) বলিয়া সম্বোধন করিতেছিল এবং সেই সম্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনুপম চোখের যে বিচিত্র ভঙ্গী করিয়া আমাকে ইশারা করিতেছিল তাহা যদি আপনি দেখিতেন! আবার

তাহার শওহরের পিছনে তাহাকে হাজারো রকম মুখভঙ্গী করিয়া ভেঙ্‌চাইতেও ছাড়িতেছিল না। আমি ক্রোধে বিরক্তিতে জ্বলিয়া যাইতেছিলাম—সমস্ত রাত আমি তাহার সহিত কথা কহিলাম না।

সকাল বেলা আমরা আমাদের মালপত্র বস্তাবন্দী করিয়া রওনা হইয়া দেখিলাম ডজন খানেক ঘোড়সওয়ার গোলান্দাজ আমাদের পিছে তাড়া করিয়াছে। পাহাড়িয়ারা নিজেদের সাহসের বীরত্বের দেমাক হামেশাই করিয়া থাকে—খুন-খারাপীর কথা ছাড়া তাহাদের কথাই নাই, মনে হয় যেন তাহাদের কথাগুলাই রক্তাক্ত ও রক্তপিপাসু! তাহারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়াই নিজেদের খুব বীরত্ব দেখাইল—সঙ্গীদের কাহারও প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে চোঁ-চাঁ দৌড় দিল। ঘলিওয়াজ খাঁ, বাজ খাঁ, ফিরোজা ও আর-একজন ওয়াজিরি ছোক্‌রা তাহাদের আক্কেলের পরিচয় দিয়া ছুট দিল; কয়েক জন কোন্ পথে পালাইবে ঠিক করিতে না পারিয়া মালবোঝাই খচ্চরগুলাকে ছাড়িয়া দিয়া পাহাড়ের গভীর খাদের মধ্যে লাফ মারিল—সেখানে তাহারা যমের হাতে আপনাদিগকে সোপর্দ্দ করিয়া দিল, পুলিসের সওয়ারদের সেখানে গিয়া তাহাদিগকে গেরেপ্তার করিবার আর কোনো সম্ভাবনার আশঙ্কাই তাহাদের রহিল না। আমাদের খচ্চরগুলিকে বাঁচাইবার আর কোনো সম্ভাবনাই নাই দেখিয়া আমরা খচ্চরের পিঠে বোঝাই মালের বস্তাগুলি খুলিয়া দামী দামী জিনিসগুলি নিজেদের পিঠেই

লাদিয়া লইতে লাগিলাম এবং পাহাড়ের খাড়া ও আবুড়া-খাবুড়া গা বাহিয়া পালাইবার জন্ত প্রস্তুত হইলাম; আমরা খাড়া ঢালু জায়গায় আমাদের মালের বস্তা গড়াইয়া দিয়া সেই বস্তা ধরিয়া নিজেরাও কোনো রকমে গড়াইয়া গড়াইয়া এক এক নিমিষে এক এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলাম; আর আমাদের দুশ্‌মনেরা আমাদের পিছনে ক্রমাগত বন্দুক ছাড়িতে-ছিল। কানের কাছ দিয়া বন্দুকের গুলি ছোটার সন্‌সন্‌ শব্দ শোনার অভিজ্ঞতা এই আমার প্রথম না হইলেও তাহা বেশ আরামজনক বা অগ্রাহ্য করিবার মতন মোটেই বোধ হইতেছিল না। যাহার ফিরোজার মতন স্ত্রীকে বিবাহ করিবার বাসনা ও সম্ভাবনা আছে তাহার মৃত্যুস্বয়ম্বর বেশ মনঃপুত হইবার কথাও নয়।

আমরা সকলেই অক্ষত—অবশ্য বন্দুকের গুলিতে অক্ষত, নতুবা পাথর-কাঁকরের ঘর্ষণে ক্ষত-বিক্ষত—শরীরে অব্যাহতি পাইলাম, একজন ছাড়া। তাহার নাম দোস্ত্ মহম্মদ—সে দলের মধ্যে সকলের চেয়ে বয়সে ছোট, তাহার সকলের চেয়ে বেশীদিন বাঁচিবার কথা, কিন্তু বেচারা পিঠে গুলি খাইয়া মুখ থুব্‌ড়াইয়া পড়িয়া গেল। আমি আমার পিঠের বস্তা ফেলিয়া তাহাকে ধরিয়া তুলিতে গেলাম।

ফিরোজার স্বামী বাজ খাঁ বকিয়া উঠিল—আহাম্মক কোথাকার! ঐ মুর্দ্দা লাস লইয়া তুমি করিবে কি? তোমার বস্তা তুলিয়া লও—একটা মড়ার জন্ত বারুদগুলা বরবাদ করিও না।

ফিরোজাও আমাকে বলিল—ওকে ফেলিয়া দাও।

আমি দোস্ত্ মহম্মদকে ঘাড়ে করিয়া বহিয়া আনিতেছিলাম; ক্লান্ত হইয়া আমি তাহাকে একটা ছায়া জায়গায় পাথরের আড়ালে নামাইয়া রাখিলাম। বাজ খাঁ আগাইয়া আসিয়া তাহার বন্দুকের কুঁদার আঘাতে বেচারা দোস্ত্ মহম্মদের মাথাটা একেবারে থেঁতো করিয়া দিল। এবং সেই বিকৃত মুখের দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিল—এখন যে ইহাকে সনাক্ত করিতে পারিবে সে বহুৎ বাহাদুর।

সাহেব, এই রকম আনন্দ ও সন্তোষের জীবন আমি অবলম্বন করিয়াছিলাম।

সন্ধ্যাকালে আমরা এক জঙ্গলে গিয়া পড়িলাম। আমরা মেহনতে একেবারে হালাকান্ হইয়া পড়িয়াছিলাম, খাইবার সামগ্রী কিছু সঙ্গে ছিল না, তাহার উপর খচ্চর ঘোড়া মাল-মাত্তা খোয়াইয়া একেবারে সর্ব্বস্বান্ত! এই অবস্থাতেও বাজ খাঁটা কি করিল জানেন?—সে বনের শুক্‌নো কাঠ কুড়াইয়া চকমকি ঠুকিয়া আগুন জ্বালাইল, এবং সেই আগুনের আলোতে এক জোড়া তাস বাহির করিয়া ঘলিওয়াজ খাঁর সঙ্গে খেলা করিতে বসিয়া গেল।—এরা মানুষ, না শয়তান! ঘলিওয়াজ মানে চিল, আর বাজ মানে শ্যেন—দুইটাই সমান! আমি একেবারে ক্লান্ত হইয়া চিতপাত হইয়া শুইয়া পড়িয়াছিলাম—আমার চোখের উপর হাজারো নক্ষত্র চোখ রাখিয়া চোখ মট্‌কাইতেছিল; আমি তারার দিকে তাকাইয়া দোস্ত্ মহম্মদের কথা ভাবিতেছিলাম,

আর ইচ্ছা করিতেছিলাম যে তাহার দশা আমার হইলে ভালো হইত। ফিরোজাও আমার পাশে শুইয়া ছিল; সে থাকিয়া থাকিয়া দুটা কাঠে কাঠে ঠকাঠক বাজাইয়া গুন্‌গুন করিয়া গান ধরিতেছিল। সে মাঝে মাঝে—যেন আমার কানে কানে চুপিচুপি কথা বলিতে আসিতেছে এমনি ভাবে—মুখ সরাইয়া আনিয়া আমাকে—এক রকম আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই—দুই তিনবার চুম্বন করিল।

আমি তাহাকে বলিলাম—তুমিই শয়তান!

সে সহজ ভাবেই স্বীকার করিল—বেশক্।

কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামের পর ফিরোজা আবার থল শহরে ফিরিয়া গেল।

পরদিন সকাল বেলা একটা ভেড়াওয়ালা আমাদের কিছু রোটী গোশ্‌ৎ আর দুধ আনিয়া দিল—বুঝিলাম ফিরোজা পাঠাইয়াছে। আমরা সমস্ত দিন সেই বনের মধ্যে লুকাইয়া থাকিলাম। রাত্রি হইলে, অন্ধকারে গা-ঢাকা হইয়া আমরাও থলের দিকে রওয়ানা হইলাম।

আমরা শহরের সীমানায় গিয়া ফিরোজার খবরের জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলাম; কিন্তু কাহারও দেখা নাই।

অপেক্ষায় প্রতীক্ষায় প্রভাত হইয়া গেল। আমরা দেখিলাম যে একজন মেম মেয়েদের ছাতা মাথায় দিয়া একটা খচ্চরে চড়িয়া আসিতেছে; তাহার সঙ্গে একজন দেশী স্ত্রীলোকও অপর একটা খচ্চরে আছে, বোধ হয় আয়া, এবং একজন সহিসও আছে।

তাহাদের দেখিয়া বাজ খাঁ বলিয়া উঠিল—খোদা আমাদের জন্য দুটা ঘোড়া আর দুটা আওরৎ পাঠাইয়া দিয়াছেন। চারটা ঘোড়া হইলে ঠিক ভাগে মিলিত। তা যাই হোক—

আন্দক্ আন্দক্ শুদ্ ব-হম্ বেসিয়ার্,—
দানা' দানা' আস্‌ৎ ঘল্লা' দর্ আম্বার্ !

তিল তিল জড়ো করি, বেশী তবে পাই ;—
দানা দানা শস্য খুঁটি ভরাই মরাই !

ও-কয়টাকে সংগ্রহ করা আমার কাজ।

বাজ খাঁ তাহার বন্দুক তুলিয়া লইল এবং ঝোপের আড়ে আব্‌ডালে লুকাইয়া লুকাইয়া পাহাড়ের গা বাহিয়া পথে নামিতে লাগিল। আমি ও ঘলিওয়াজ খাঁ তাহার পিছনে পিছনে ঐরূপ করিয়া চলিতে লাগিলাম। কাছাকাছি হইয়া আমরা মহা হল্লা করিয়া লাফাইয়া উঠিলাম ও সহিসটাকে ঘোড়া থামাইতে বজ্র-নিনাদে হুকুম করিলাম। আমাদের এই দুশ্‌মন-চেহারা, উৎকট পোশাক ও বিকট চীৎকার দুজন মেয়েলোককে ভয় পাওয়াইবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু আমরা আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম, মেম-সাহেব ভয় না পাইয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল ও বলিল —বা রে আহাম্মকগুলো! আমাকে ওরা একেবারে মেম-সাহেব মনে করিয়াছে।

অবাক্ কাণ্ড! সে ফিরোজা! এমন চমৎকার ছদ্মবেশ

করিয়াছিল যে সে যদি ইংরেজী ভাষায় কথা কহিতে পারিত তবে আমিও তাহাকে চিনিতে পারিতাম না।

সে ঘোড়া হইতে লাফাইয়া নামিয়া পড়িল এবং কিছুক্ষণ চুপিচুপি বাজ খাঁ ও ঘলিওয়াজ খাঁর সঙ্গে কি কথা বলিল। তাহার পর আমার কাছে আসিয়া বলিল—আজিজ্-ই-মন্ (প্রিয় আমার), তোমার ফাঁশী হইবার আগে আমাদের আবার মুলাকাৎ হইবে। আমি এখন বেরাদরীর কাজে কুরাম-পাসে যাইতেছি। তুমি শীঘ্রই লোকের মুখে আমার নাম জাহির হইতে শুনিবে।

ফিরোজা আমাদের নিরাপদে লুকাইয়া থাকিবার একটা আস্তানা ঠিক করিয়া দিয়া আমাদের নিকট হইতে বিদায় লইল। এই মেয়েটি ছিল আমাদের দলের শ্রেষ্ঠ সঞ্চয়, বুদ্ধির পুঁজি, নিরাপদ্ বন্দর। শীঘ্রই আমরা তাহার নিকট হইতে কিছু টাকা পাইলাম, এবং তাহার চেয়েও মূল্যবান্ এক খবর পাইলাম যে দুজন ইংরেজ কুরাম-পাসের ভিতর দিয়া মিরান্-শা শহরের দিকে যাইবে। ফার্সীতে একটা কথা আছে—আকিল্-রা ইশারৎ বস্ আস্ৎ—আক্কেলওয়ালা লোকের কাছে ইশারাই যথেষ্ট হয়। আমরা ফিরোজার খবরের সদ্ব্যবহার করিলাম। সাহেব দুটার কাছে অনেক টাকা ও মাল পাওয়া গেল। বাজ খাঁ তাহাদের প্রাণে মারিতে চাহিতেছিল; কিন্তু ঘলিওয়াজ খাঁ ও আমি তাহাকে বাধা দিয়া সাহেব দুটার টাকা ঘড়ী জামা কাপড় প্রভৃতির ভার মোচন করিয়া দিলাম

মাত্র—জামা-কাপড়ের আমাদের বিশেষ দরকার হইয়া পড়িয়াছিল।

দেখিতেছেন সাহেব, ইচ্ছা না করিলেও অবস্থার ফেরে মানুষ দুষ্ক্রিয় বদ্‌মায়েস হইয়া উঠে। একটি সুন্দরী তরুণীর মোহে তোমার মাথা ঘুরিয়া গেল; তুমি তাহার জন্য লড়াই করিলে; একটা খুন-খারাপী কাণ্ড হইয়া গেল; তখন প্রাণ বাঁচাইতে পাহাড়-জঙ্গলের কোলে লুকাইতে হইল; সেখানে লুকাইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য লুকাচুরির ব্যবসা অবলম্বন করা ছাড়া আর ত রোজ্‌গারের কোনো পথ থাকে না; চোরাই সওদাগর হইতে আর এক কদম অগ্রসর হইয়াই পুরা দস্তুর ডাকাত! কীড়া যেমন গুটিপোকা হইয়া প্রজাপতিতে পরিণত হয়, তেমনি নিজে না জানিয়াই আমি ডাকাত হইয়া উঠিলাম।

দুজন ইংরেজের ভার মোচন করিয়া দেওয়ার পর এ অঞ্চলে থাকা আর সুবুদ্ধির কাজ হইবে মনে হইল না। দেশী লোকের সর্ব্বস্ব লুঠ করিলেও ইংরেজের তত আপত্তি হয় না; কিন্তু একটা ইংরেজের এক পয়সা ছিনাইয়া লইলে সমস্ত ইংরেজ-গভর্মেণ্ট্‌ মার-মুখো হইয়া উঠে—ফৌজ পল্টন লশ্‌কর, কামান বন্দুক তরোয়াল, বল্লম সঙ্গীন আস্‌মান-জাহাজ, কত কি যে চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া আসে তাহার ইয়ত্তা থাকে না, এবং প্রকৃত দোষীকে খুঁজিয়া ধরিতে না পারিলে নির্দ্দোষীদের উৎপীড়ন ও উৎসাদন করিয়া ইংরেজের মহিমা ও প্রভাব প্রচার করিয়া

দেওয়া হয়। সুতরাং আমরা সে অঞ্চল ছাড়িয়া আফ্‌গানিস্তানের এলাকা খোস্ত্‌ সহরে গিয়া লুকাইলাম। সেখানে আর-একজন নামজাদা ডাকাতের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পরিচয় হইল—তার কথাও আপনি শুনিয়াছেন—সে আজব খাঁ। সে সঙ্গু-খেল্‌ সিন্‌ওয়ারী। সে তাহার স্ত্রীকে লইয়াই ডাকাতি করিয়া বেড়াইত। তাহার স্ত্রীটি বেশ সুন্দরী, সভ্য ভব্য, লজ্জা-সরমে নম্র, কখনো মুখে অকথ্য অশ্লীল কথা উচ্চারণ করে না, এবং স্বামীর প্রতি পরম-অনুরাগিণী সাধ্বী সতী! এই-সব গুণের জন্য তাহার স্বামী তাহাকে পুরস্কার দিত তাহার সহিত সর্ব্বপ্রকারে মন্দ ব্যবহার করিয়া। সে সর্ব্বদা স্ত্রীকে তিরস্কার করিত, কথায় কথায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া উঠিত, নিজে দুশ্চরিত্র হইয়া স্ত্রীকে সন্দেহ করিত। একবার সে এইরূপ মিথ্যা সন্দেহের বশে স্ত্রীকে ছোরা মারিয়া জখম করিয়া দিয়াছিল; এবং এর জন্য সে স্ত্রীর ভক্তি শ্রদ্ধা ভালোবাসা আরো বেশী করিয়া পাইয়াছিল। স্ত্রীলোকের—বিশেষত পাহাড়িয়া দেশের স্ত্রীলোকের—স্বভাবই এমন রহস্যজটিল! সেই স্ত্রীটি স্বামীর দান সেই আঘাত-চিহ্নটি লোককে বাহু উন্মোচন করিয়া দেখাইত—জগতে এমন সুন্দর দর্শনীয় সামগ্রী যেন আর নাই এবং তাহার অধিকারিণী বলিয়া সে গর্ব্ব অনুভব করিত। আজব খাঁটা সঙ্গী হিসাবেও অধম ছিল। একবারের শিকারে সে এমন বাহাদুরী দেখাইয়াছিল যে যত রোজ্‌গার ও লাভ হইয়াছিল তাহার এবং যত মার খাইয়াছিলাম আমরা। যাক তাহার কথা, এখন আসল গল্প বলি।

অনেক দিন ফিরোজার কোনো খবর না পাইয়া ঘলিওয়াজ খাঁ বলিল—আমাদের একজনকে কুরাম-পাসের ভিতর দিয়া বান্নুতে যাইতে হয়, যদি সেখানে ফিরোজার কোনো খবর মিলে। সে এতদিনে নিশ্চয় কিছু জোগাড়-যন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে। আমি নিজে যাইতে পারিতাম, কিন্তু বান্নুতে আমাকে সকলেই চেনে।

এক-চোখো বাজ খাঁটা বলিয়া উঠিল—আমারও সেই একই কথা। আমি ওখানে লাল-মুখো বাঁদরগুলোকে অনেক নাচন নাচাইয়া আসিয়াছি; আমার পুঁজি মাত্র একটা চোখ; সকল দিকে নজর না রাখিতে পারিলে কখন কোন্ বাঁদরের পাল্লায় পড়িয়া যাইব—এক চোখ দেখিয়া সনাক্ত করিতে উহাদের বিলম্বও হইবে না।

বাজ খাঁ ইংরেজদিগকেই লাল-মুখো বানর বলিতেছিল। উহারা দুজনে যাইতে পারিবে না, সুতরাং আমাকেই যাইতে হয়। ফিরোজাকে দেখিতে পাইবার সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়া আমি বলিলাম—তবে আমি যাইব। সেখানে গিয়া কি করিতে হইবে?

উহারা দুজনে বলিল—বান্নুতে গিয়া চৌকে মেওয়াওয়ালা কাওয়াই খাঁকে সন্ধান করিয়া বাহির করিবে। সে তোমাকে ফিরোজার সন্ধান বলিতে পারিবে। ফিরোজার সঙ্গে মুলাকাৎ হইলে কি করিতে হইবে সেই তোমাকে বাতাইয়া দিবে।

আমরা তিনজনেই খোস্ত্ হইতে রওয়ানা হইয়া মিরান্-শা

শহরে আসিলাম। উহারা দুজনে সেখানেই রহিল, আমি বান্নুতে রওয়ানা হইলাম—মেওয়াওয়ালার ছদ্মবেশে। পথে এক সরাইএ আমাদের বেরাদরীর একজন লোক আমাকে একটা খচ্চর দিল; তাহার পিঠে সেব ও তর্‌মুজের বস্তা লাদিয়া বান্নুর দিকে রওয়ানা হইলাম।

বান্নুর চকে গিয়া কাওয়াই খাঁর সন্ধান করিলাম। খাঁ-সাহেব সেখানকার প্রসিদ্ধ নামজাদা মশুর আদ্‌মী—তাহাকে অনেকেই চেনে দেখিলাম,কিন্তু খাঁ-সাহেবের তল্লাস সে তল্লাটে কেহই দিতে পারিল না। হয় সে লোকটা মরিয়া গিয়াছে, অথবা জেলখানায় আটক আছে। এইজন্যই ফিরোজা আমাদের কাছে কোনো খবর পাঠাইতে পারে নাই বুঝিলাম। আমি একটা সরাইখানায় বাসা লইলাম; এবং প্রায় সমস্ত দিনই পথে পথে মেওয়া ফেরি করিয়া বিক্রী করিতে লাগিলাম—তাহা ছল মাত্র, আমার মনোহরণ একখানি মুখ একটিবার কোথাও দেখিতে পাইব এই উদ্দেশ্যই তখন আমার মন প্রাণ পরিপূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতেছিল। বান্নু শহরে বেলুচী আফগান ওয়াজিরি আফ্রিদি সিন্ধী পার্সী পাঞ্জাবী ইংরেজ বাঙালী হরেক রকমের লোকের ব্যবসা আছে, কতগুলা ইরাণী বেদে মেয়ে-পুরুষের সঙ্গেও দেখা হইল; কিন্তু কাহাকেও বিশ্বাস করিয়া ফিরোজার খবর জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছিলাম না।

দুইদিন নিস্ফল ঘোরাঘুরির পরও যখন কাওয়াই খাঁ কিম্বা ফিরোজা কাহারও সন্ধান বাহির করিতে পারিলাম না, তখন

কিছু সওদা করিয়া সঙ্গীদের কাছে ফিরিয়া যাইব কি না ভাবিতে ভাবিতে পথ চলিতেছিলাম। তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে; সন্ধ্যার ধূসরতা পথ আচ্ছন্ন করিয়াছে, অথচ তখনও শহরের পথে আলো জ্বালা হয় নাই। পথের ধারের একটা বাড়ীর দোতলার উপর হইতে একজন স্ত্রীলোকের কণ্ঠের ডাক শুনিলাম—"এই মেওয়াওয়ালা, মেওয়াওয়ালা!" আমি উপর দিকে তাকাইয়া দেখিলাম—ফিরোজা! সেই বাড়ীর বারান্দায় রেলিঙের উপর ঝুঁকিয়া সে আমায় ডাকিতেছে; তাহার পাশে দাঁড়াইয়া আছে একজন ইংরেজ—তাহার চেহারাটা বেশ জমকালো জাঁদ্রেল কসমের, মিলিটারী বড় অফিসারের পোশাক, বেশ শাঁসালো লোক হইবে বোধ হইল। আর ফিরোজাও বহুৎ উম্‌দা পোশাক পরিয়া ছিল—তাহার গায়ে একখানা জরির শাল, চুলে একখানা সোনার চিরুণী গোঁজা, রেশমী ঘাঘ্‌রা; আর চালাকী বুদ্ধিতে ঝলমল করিতে করিতে বেতর বেশী হাসিয়া হাসিয়া লুটাইয়া সে সাহেবের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছিল। ইংরেজটা জংলী ধরণের উর্দ্দু ভাষায় আমাকে ডাকিয়া উপরে যাইতে বলিল—বিবি সাহেব কিছু মেওয়া খরিদ করিবেন। ফিরোজা আমাকে পশ্‌তু ভাষায় বলিল—"উপরে চলিয়া আইস, কিন্তু যাহা দেখিবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইও না বা চটিয়া উঠিও না যেন।" যেখানে ফিরোজা আছে, সেখানে কোনো অঘটন ঘটনা দেখিয়াই আশ্চর্য্য হইবার কথা নয়; তবে তাহাকে আবার দেখিতে পাইয়া আমি খুশী হইয়াছিলাম, না

হতাশ ও রুষ্ট হইয়াছিলাম তাহা ঠিক করিয়া বলা শক্ত। একজন লম্বা উর্দ্দিপরা খানসামা আমাকে পথ দেখাইয়া উপরে লইয়া গেল এবং একটা পরীস্থানের মতন সুসজ্জিত কামরায় প্রবেশ করাইল।

আমি ঘরে ঢুকিবা মাত্র ফিরোজা পশ্তু ভাষায় বলিয়া উঠিল—হুশিয়ার আজিজ-ই-মন্ (প্রিয় আমার), তুমি পশ্তু ছাড়া আর কোনো ভাষা বোঝো না, আর আমাকে চেনোও না।

তার পর সে ইংরেজটার দিকে ফিরিয়া উর্দ্দুতে বলিল—দেখিলে, আমার কথাই ঠিক, লোকটা জংলী কাবুলী, সবে বন থেকে বাহির হইয়া আসিয়াছে, এদেশের কথার এক বর্ণও ও বোঝে না। দেখিতেছ উহার বোকার মতন চেহারাটা? যেন বিড়াল হাঁড়ি খাইতে আসিয়া ধরা পড়িয়া ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গিয়াছে।

আমি পশ্তু ভাষায় বলিয়া উঠিলাম—আর তোমার চেহারাটা হইয়াছে বে-হায়া বেশরম কাহবার মতন! আমার ইচ্ছা হইতেছে তোমার দিল্দারেব মুখের সাম্নে তোমার মুখটা ছোরা দিয়া তরমুজের মতন হাঁসাইয়া দি।

ফিরোজা বলিল—আমার দিল্দার! কী চমৎকার আবিষ্কারই করিয়াছ! এই আহাম্মকটাকে দেখিয়া তোমার আবার হিংসা হইতেছে? তোমার আক্কেল কি কোনোদিনই হইবে না?—সেই জিলেপী-গলিতেও যেমন আর এই বাম্বু শহরেও তেমনি

বুদ্ধির পরিচয় দিতেছ। দেখিতেছ না বে-আক্কেল, আমি বেরাদরীর কাজেই নিযুক্ত আছি আর এই রকম নবাবী কায়দায় তাহা হাসিল করিতেছি!—এই বাড়ীটা আমার হইয়া গিয়াছে; লালমুখো বানরটার টাকাগুলাও আমার হইবে। আমি তাহার নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইয়া নাচাইয়া লইয়া ফিরিব এবং জাহান্নমে শয়তানের হাতে এমন করিয়া সঁপিয়া দিব যে কেয়ামতের দিনেও যেন নিষ্কৃতি না পায়।

আমি বলিলাম—আর আমার কথা তোমায় বলি, যদি তুমি বেরাদরীর কাজ এই রকম করিয়া হাসিল করিতে থাক, তাহা হইলে আমি তোমাকে সুদ্ধ জাহান্নমে শয়তানের হাতে সোপর্দ্দ করিয়া দিব, যেন কেয়ামতের আগে এমন অনাচার আর করিতে না পারো।

ফিরোজা বলিয়া উঠিল—ইয়া ইস্‌ৎ (সত্য নাকি)! তুমি কি আমার স্বামী যে আমাকে হুকুম করিয়া ভয় দেখাইতে আসিয়াছ? এক-চোখোটা ত খুশী ও রাজী আছে। তুমি এখানে আমার কি বদখেয়ালী দেখিলে যে রাগ করিতেছ? আমার একমাত্র দিল্‌দার আজিজ হইবার সৌভাগ্যেই কি তোমার খুশী থাকা উচিত নয়?

ইংরেজটা ফিরোজাকে জিজ্ঞাসা করিল—লোকটা কি বলিতেছে?

ফিরোজা বলিল—লোকটা জংলী, তোমার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছে। তাই তোমাকে দোয়া দিতেছে।

আমাদের কথার এই চমৎকার সদর্থ করিয়া ফিরোজা খিলখিল করিয়া হাসিতে হাসিতে একটা কুর্শীর উপর লুটাইয়া পড়িল।

সাহেব, যখন সেই মেয়েটি হাসে তখন তাহার হাসির স্রোতে বুদ্ধি বিবেচনা সব ভাসিয়া যায়। সেই সাহেবটাও বোকার মতন সর্ব্বাঙ্গ কাঁপাইয়া হাসিতে লাগিল।

ফিরোজা একটু দম লইয়া বলিল—বানরটার আঙুলে আংটিটা দেখিতেছ? পছন্দ হয়? চাও ত ওটা তোমাকে দিয়া দিতে পারি।

আমি বলিলাম—সাহেবকে আমাদের পাহাড়ের এলাকায় পাইবার জন্য আমি একটা আঙুল দিতে রাজী আছি। তার পর একখান তলোয়ারের ওয়াস্তা।

সাহেবটা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—তলোয়ার? তলোয়ারের কথা ও কি বলিতেছে?

ফিরোজা খিলখিল করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—তলোয়ার! ওদের ভাষায় তলোয়ার মানে তরমুজ। ও বলিতেছে, তোমাকে একটা তর্ ও তাজা তরমুজ খাইতে দিবে।

ইংরেজটা বলিল—বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা, একঠো আজ দেও, কাল ফিন্ তলোয়ার লাও!

এই সময় খান্সামা আসিয়া খবর দিল—খানা তৈয়ার হায় সাহেব।

সাহেব ফিরোজার বাহু নিজের বাহুতে জড়াইয়া লইয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া চলিল, যেন সে নিজে এ ঘর থেকে ও-ঘরে যাইতে পারিত না। এবং পকেট হইতে একটা টাকা আমার সাম্‌নে ফেলিয়া দিয়া বলিল—কাল ফিন্ মেম-সাহেবকো লিয়ে মেওয়া লাও।

ফিরোজা ক্রমাগতই হাসিতেছিল, সে বলিল—আজিজ-ই-মন, তোমাকে খাইতে নিমন্ত্রণ করিতে পারিলাম না; কিন্তু কাল সকালে ফৌজের কাওয়াজের নাক্কারা বাজিলে তোমার মেওয়া লইয়া এখানে আসিও। জিলেপী-গলির চেয়ে এখানে আরামের আয়োজন দেখিতে পাইবে, এবং দেখিবে যে আমি তোমারই ফিরোজা। তখন আমরা বেরাদরীর ব্যাপারের আলোচনারও অবসর পাইব।

আমি কোনো জবাব না দিয়া বিদায় লইলাম। যখন রাস্তায় নামিলাম, সাহেবটা বারান্দা হইতে ডাকিয়া বলিল—কাল ফিন্ তলোয়ার লে আওগে—ইয়াদ্ রাখো।

আবার আমি ফিরোজার হাস্যধ্বনি শুনিতে পাইলাম।

আমি চলিতে লাগিলাম—কোন্ দিকে, কতক্ষণ, কেন, কিছুরই হুঁস ছিল না। সমস্ত রাত আমার ঘুম হইল না, এবং সকালে আমার মেজাজ এমন বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছিল যে আমি সঙ্কল্প করিলাম যে ঐ বিশ্বাসঘাতিনী শয়তানীর সঙ্গে আর দেখা না করিয়াই বান্নু ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। কিন্তু যেই পল্টনের কাওয়াজ করিতে যাইবার নাক্কারা ও বিউগল্ বাজিয়া

উঠিল, অমনি আমার সব সঙ্কল্প আমার মনের তল্লাট ছাড়িয়া পলায়ন করিল, আমি মেওয়ার ঝুড়ি মাথায় করিয়া ফিরোজার দর্শনের লালসায় দৌড়িলাম। আমি মানস-নেত্রে তাহার লালসা-হিংসা-ভরা বড় বড় চোখ দুটি দেখিতে লাগিলাম।

আমি তাহার বাড়ীতে গেলে খান্‌সামা আমাকে ভিতরে লইয়া গেল। ফিরোজা খান্‌সামাকে বাজারে পাঠাইয়া দিল। যেই আমাদের কাছে আর কেউ রহিল না, সে অমনি তাহার স্বাভাবিক মায়া-হাস্তে ফাটিয়া পড়িয়া ঝাঁপাইয়া আসিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিল। আমি তাহাকে এমন সুন্দর মনোহর মনোরম এর পূর্ব্বে আর কখনো দেখি নাই। রাণীর মতন, নব বধূর মতন তাহার বেশ, ভূষা, আস্‌বাব, মোকান্—তাহার চারিদিকে ঐশ্বর্য্য,—সোনা রূপা রেশম মখ্‌মল জরি; তাহার অঙ্গে বস্ত্রে আসনে ফুলবাগানের খুশ্‌বু ভুরভুর করিতেছিল। আমি তাহার জন্য যে ডাকাত হইয়াছিলাম তাহা আমার পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে হইতেছিল।

ফিরোজা আমাকে বলিল—আজিজ-ই-মন্, দিল্‌দার, আশিক! কি বলিয়া যে তোমাকে ডাকিলে আমার হৃদয়ের আগ্রহ প্রকাশ করিতে পারিব, জানি না। আমার ইচ্ছা করিতেছে এখানকার সব জিনিস ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ঘরে আগুন লাগাইয়া আমাদের পাহাড়িয়া জঙ্গলের কোলে ফিরিয়া যাই।

তাহার পর তাহার আদর ও তাহার হাস্য—সে কী ঘটা! সে নাচিয়া গাহিয়া নিজের পোশাক ছিঁড়িয়া একেবারে পাগল

হইয়া উঠিল—কোনো বানরী কখনো এমন করিয়া মুখ খিচায় নাই বা এমন করিয়া দুষ্টামির খেলা খেলে নাই। যখন সে একটু প্রকৃতিস্থ হইল তখন সে বলিল—"শোনো দোস্ত্, আমি এখানে বেরাদরীর কাজেই নিযুক্ত আছি। সাহেবটা আমাকে লইয়া এখান থেকে ইশা-খেল যাইবে—সেখানে আমার এক মহা ধর্ম্মিষ্ঠা বহিন আছে। (উচ্চ হাস্য)। আমরা যে পথে যাইব তাহা তোমাকে বলিয়া দিব। পথে তোমরা ওটার উপর পড়িয়া উহার সব কিছু লুটিয়া লইবে। উহাকে একদম নিকাশ করিয়া দেওয়াই বেহ্তর হইবে, তাহা হইলে ফরিয়াদ নালিশ করিতে পারিবে না। কিন্তু—" এইবার সে তাহার অনন্নুকরণীয় শয়তানী হাসিতে মুখ ভরিয়া বলিতে লাগিল—"তুমি কি করিবে জানো? ঐ একচোখোটাকে আগাইয়া দিয়া তুমি একটু পিছনে আড়ালে থাকিয়ো—ঐ লম্বামুখোটা খুব সাহসী আর খুব চট্‌পটে ক্ষিপ্র, উহার বেশ ভালো বন্দুক পিস্তল আছে—বুঝিলে ত?"

ফিরোজার কথা তাহার হাসির ধমকে থামিয়া গেল। তাহার সেই হাসিতে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। আমি বলিলাম—আমি বাজ খাঁকে পছন্দ করি না, উহাকে ঘৃণা করি। তবু সে আমাদের দলের লোক। একদিন আমি হয়ত আমাদের দেশী বীরের প্রথাতে তাহার এস্তেজারি হইতে তোমাকে অব্যাহতি দিতে পারিব। কিন্তু আমি বে-ইমানী করিতে পারিব না। আমি অবস্থার ফেরে ডাকাত হইয়াছি, কিন্তু ইমানদারী ছাড়ি নাই।

সর্ব্বনাশের নেশা

সে বলিল—তুমি বে-আক্কেল, আহাম্মক, জংলী। যে কাজ বিনা বিপদে নির্ব্বাহ হইতে পারে তাহার জন্য প্রাণ বিপন্ন করা কি বুদ্ধিমানের কাজ? কথায় বলে—যা শত্রু পরে পরে। তুমি আমাকে ভালোবাস না—যাও, তোমার সঙ্গে আমি আর কোনো সম্পর্ক রাখিতে চাহি না। তুমি চলিয়া যাও।

সে যখন বলিল—যাও, আমি যাইতে পারিলাম না। আমি ফিরোজার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বিদায় লইলাম।

আমি আরও দুদিন বান্নুতে ছিলাম। ফিরোজা এমন দুঃসাহসী যে সে দুদিনই ছদ্মবেশে আমার সরাইয়ে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। দুদিন পরে আমি ফিরোজার কাছে ইংরেজটার যা'বার পথ ও সময়ের খবর লইয়া আমাদের দলের মিলনস্থানে ফিরিয়া আসিলাম। আমি দেখিলাম ঘলিওয়াজ ও বাজ আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আমরা সমস্ত রাত্রি বনের মধ্যে আগুন জ্বালাইয়া কাটাইলাম। আমি বাজ খাঁকে এক দান তাস খেলিতে ডাকিলাম। সে রাজি হইল। দোস্‌রা বাজিতে আমি তাহাকে বলিলাম যে সে জুয়াচুরি করিয়া আমাকে ঠকাইতেছে। সে হাসিতে লাগিল। আমি আমার হাতের তাসগুলা ছুড়িয়া তাহার মুখে মারিলাম। সে তাহার বন্দুক তুলিতে গেল, আমি তাহা পা দিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম—বন্দুক দিয়া লড়া ত কাপুরুষের কাজ। দিলাবর মরদ যে সে ছোরা কি তলোয়ার লইয়া লড়ে। শুনিয়াছি যে তুমি ছোরা চালাইতে মজ্‌বুত। আমার সঙ্গে একহাত ছোরা লড়িয়া দেখিবে?

ঘলিওয়াজ আমাদের নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু আমি বাজ খাঁকে গোটাকতক ঘুষি লাগাইয়া তাহাকে খুব রাগাইয়া তুলিয়াছিলাম; এবং রাগে তাহার সাহস বাড়িয়া গিয়াছিল। সে নিজের কোমরবন্দ হইতে তাহার ও আমি আমার ছোরা বাহির করিয়া দাঁড়াইলাম। আমি ঘলিওয়াজকে একপাশে দাঁড়াইয়া ন্যায়যুদ্ধ কাহাকে বলে দেখিতে বলিলাম। সে দেখিল আমাদিগকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা বৃথা, সে সরিয়া দাঁড়াইল। শিকার ধরিবার সময় বিড়াল যেমন করিয়া সর্ব্ব-শরীর গুটাইয়া লাফ মারিবার জন্য ওত পাতিয়া থাকে, বাজ খাঁ তেমনি কুঁজো হইয়া আক্রমণের সুযোগ খুঁজিতেছিল। তাহার ডান হাতে ছোরা ও বাঁ হাতে তাহার পাগড়ীটা জড়ানো—সেটা তাহার ঢাল হইয়াছে। আমি তাহার সাম্‌নে সটান সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম—বাঁ পা সাম্‌নে বাড়াইয়া, বাঁ হাত উর্দ্ধে তুলিয়া, আর ডান হাতে ছোরা ধরিয়া ডান উরুর কাছে ঝুলাইয়া রাখিয়া। আমি একটা জিন দানবের চেয়েও নিজেকে বলবান্ বিবেচনা করিতেছিলাম। বাজ খাঁ বিদ্যুৎ-চমকের মতন আমার উপরে আসিয়া পড়িল, আমি বাঁ পায়ের ভরে চট্ করিয়া ঘুরিয়া গেলাম, সে তাহার সাম্‌নে কিছুই না পাইয়া হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িয়া যাইতেছিল, কিন্তু আমি তাহার গলাটাকে আমার ছোরা দিয়া এমন করিয়া ঠেক্‌নো দিলাম যে আমূল সমস্ত ছোরাটা তাহার গলার মধ্যে ঢুকিয়া গেল ও আমার মুঠিটা তাহার চিবুকের নীচে থক্ করিয়া স্থগিত হইয়া গেল—আমি এমন করিয়া না ধরিলে

বেচারা মুখ থুব্‌ড়াইয়া পড়িয়া যাইত। আমি তাহাকে খাড়া করিয়া এক ঝট্‌কায় ছোরাখানা টানিয়া বাহির করিতে গেলাম —এমন জোরে হেঁচ্‌কা টান দিয়াছিলাম যে আমার ছোরাটার বাঁট ভাঙিয়া গেল ও ফলাখানা বাজখাঁ গলার ভিতর গিলিয়াই রাখিল। তাহাকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া দিলাম। তাহার গলার কাটা হইতে আমার হাতের মতন মোটা ধারায় ফিন্‌কি দিয়া রক্ত ভলকে ভলকে বাহির হইতে লাগিল এবং রক্তের ঠেলায় ছোরার ফলাখানা ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইয়া পড়িল। সে কাঠের কুঁদোর মতন নিস্পন্দ আড়ষ্ট। সব শেষ হইয়া গিয়াছে।

ঘলিওয়াজ খাঁ বিলাপ ও বিস্ময়ের স্বরে বলিতে লাগিল— আয়্‌ খোদা! আয়্‌ খোদা! হায় আফ্‌শোষ! চেহ্‌ শুদ্‌ (কি হইল)!

আমি বলিলাম—শুনো ইয়ার, বুদ্‌ হম্‌পেশা বা হম্‌পেশা দুশ্‌মন—এক ব্যবসায়ের দুজন লোক পরস্পরের শত্রু—আমাদের দুজনের একসঙ্গে বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। আমি ফিরোজাকে ভালোবাসি, আমি একলা তাহাকে পাইতে চাই, একলা তাহার হইতে চাই। তাহা ছাড়া বাজ খাঁটা জানোয়ার ছিল—বেচারা দোস্ত্‌ মহম্মদকে ও কেমন নিষ্ঠুর হিংস্রভাবে অকারণে খুন করিয়াছিল জানো ত! আমরা এখন দুজনে ঠেকিলাম, আমরা দুজনেই ভালো লোক। দেখ—আমাকে জীবনে মরণে তুমি তোমার সঙ্গী দোস্ত্‌ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারিবে?

ঘলিওয়াজ তাহার হাত বাড়াইয়া দিল। তাহার বয়স বছর পঞ্চাশ হইয়াছিল। সে বলিল—তোমার ভালোবাসা প্রণয় লইয়া তুমি জাহান্নমে যাও—তাহার সহিত আমার কোনো সম্পর্ক নাই। তুমি বাজখাঁর কাছে ফিরোজাকে চাহিলে সে এক পয়সা দামে ফিরোজাকে খুশী মনে বিক্রী করিয়া দিতে পারিত। এখন ত আমরা দুজন, কাল সেই ইংরেজটার ব্যবস্থা কি হইবে?

আমি বলিলাম- সে ভার আমার। এখন আমি সারা দুনিয়ার মুখের কাছে তুড়ি মারিয়া আসিতে পারি।

আমরা বাজ খাঁকে কবর দিলাম এবং সেই কবরের দুইশত কদম দূরে আমাদের তাঁবু খাটাইলাম।

পরদিন ফিরোজা ও তাহার কাপ্তেন দুটা ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়া হাজির, সঙ্গে দুজন সহিস ও একজন খান্‌সামা।

আমি ঘলিওয়াজকে বলিলাম—ইংরেজটাকে আমি দেখিয়া লইব। অপর তিন জনের ভার তোমার—উহাদের সঙ্গে কোনো হাতিয়ার নাই।

ইংরেজটা খুব সাহসী যোদ্ধা। যদি ফিরোজা তাহার হাত নাড়াইয়া না দিত তবে সে আমাকে গুলি করিয়া মারিত। সংক্ষেপে বলি, আমি ফিরোজাকে সেদিন পুনর্জয় করিলাম এবং প্রথম কথা তাহাকে এই বলিলাম যে সে বেওয়া—বিধবা হইয়াছে। যখন সে বুঝিতে পারিল যে এমন সুঘটন কেমন করিয়া হইল, তখন সে বলিল—তুমি চিরকালের বে-আক্কেল ছেলেমানুষ! বাজ খাঁ তোমাকে খুন করিলে বেশ হইত! সে তোমার চেয়ে

জবরদস্ত্ লোককে খুন করিয়াছে—তোমার বাহাদুরী তাহার কাছে খাটিত না। বেচারার পরমায়ু জিন্দগী ফুরাইয়া গিয়াছিল, সে আর কি করিবে। তোমারও একদিন ফুরাইবে।

আমি বলিলাম—আর তোমারও—যদি তুমি আমার সাধ্বী সতী পত্নী হইয়া না থাক।

ফিরোজা বলিল—বহুৎ খুব! আমি অনেকদিন গণিয়া দেখিয়াছি যে আমাদের কিস্মৎ একসঙ্গে জট পাকাইয়া জড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু জানিয়ো ইয়ার, কুজায় নও আব্-রা দো রোজ সরদ্ দারদ্—নূতন কুঁজাতে জল দুদিন ঠাণ্ডা থাকে।

এই বলিয়াই সে তাহার দোকাঠি বাজাইতে শুরু করিল—কোনো অপ্রিয় প্রসঙ্গ চাপা দিতে হইলেই সে এইরূপ করিত!

মানুষ যখন নিজের কথা বলিতে আরম্ভ করে তখন অপরের কথা আর তাহার মনে থাকে না। আমার নিজের কাহিনীর এত বিস্তারিত বিবরণ শুনিতে শুনিতে আপনি নিশ্চয় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এইবার শীঘ্রই শেষ করিব। আমরা যে জীবন যাপন করি তাহার কাহিনী অফুরন্ত।

আমি ও ঘলিওয়াজ খাঁ আগের চেয়ে বিশ্বাসী আরো কয়জন সঙ্গী জুটাইয়া লইলাম। আমরা প্রধানত চোরাই ব্যবসাই করিতাম, কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে কখনো কখনো পথিকদিগকে থামাইতামও—কিন্তু সে নিতান্ত নাচার অবস্থায়, যখন আর জীবনরক্ষার কোনো উপায় থাকিত না। আমরা কখনোই কোনো রাহী পথিকের

উপর কোনো জুলুম করিতাম না, কেবল আমাদের আবশ্যক-মতো তাহার টাকা ও দু-চারটা জিনিস লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতাম।

অনেক মাস আমি ফিরোজার সঙ্গে পরম আনন্দে সুখে কাটাইলাম; সে আমাদের ব্যবসায়েও পরম সহায় ছিল, সে আমাদের ভালো ভালো শিকারের সন্ধান আনিয়া দিত, যাহাতে আমরা দুপয়সা রোজ্‌গার করিয়া লইতে পারি। সে কখনও এ-শহরে, কখনো ও-শহরে, কখনো সে-শহরে বাস করিত; কিন্তু আমার কাছ হইতে আহ্বানের একটি কথা শুনিতে পাইলেই সে সকল কাজ ফেলিয়া আমার কাছে ছুটিয়া আসিত এবং আমরা হয় কোনো পথের ধারের নির্জ্জন সরাইয়ে বা বনে জঙ্গলে আমাদের তাঁবুতে মিলিত হইতাম। কেবল একবার, নও-চমন শহরে, সে আমাকে একটু ভাবাইয়া তুলিয়াছিল। আমি জানিতাম যে সেখানে একজন ধনী দৌলৎমন্দ্‌ সওদাগরকে সে তাহার চাতুরী ও সৌন্দর্য্যের জলুসে চমক লাগাইয়া মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। সে তাহার সঙ্গে বান্নু শহরের কাপ্তেন সাহেবের কাণ্ড পুনরভিনয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ঘলিওয়াজ খাঁর সকল নিষেধ বাধা যুক্তি তর্ক অগ্রাহ্য করিয়া আমি তাহার সন্ধানে চলিয়া গেলাম এবং দিনের বেলা প্রকাশ্য ভাবেই শহরে ঢুকিয়া পড়িলাম। ফিরোজাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলাম। আমাদের দুজনের মধ্যে একটু কড়া কড়া ঝাঁঝালো কথায় একটু কাজিয়া হইয়া গেল।

ফিরোজা বলিল—তুমি কি জানো যে যবে থেকে তুমি আমার শওহর হইয়াছ তবে থেকে আমি আর তোমাকে আগের মতন ভালোবাসিতে পারি না—তুমি আমার প্রিয় ছিলে তখন যখন তুমি আমার দিল্‌দার ছিলে। আমি কাহারো এন্তেজারী বা হুকুম বরদাস্ত্ করিতে পারি না। আমি আমার নিজের খেয়াল খুশী মতন চলিতে চাই—আমি স্বাধীন মুক্ত থাকিতে চাই! জানো ত আমার নাম ফিরোজা—আমি নীল আস্‌মানের মতন প্রমুক্ত অবাধ; আমি ফিরোজা জহরের মতন বহুমূল্য, সকলের লোভনীয় কিন্তু দুর্ল ভ; আমি কালের মতন ফি-রোজা—আমি নিত্য নূতনের পক্ষপাতী। তুমি খবরদার হুশিয়ার—আমাকে বেশী দূর ঠেলিয়া লইয়া যাইও না; বেশী কষাকষি করিয়া আমাকে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়ো না—দড়ি ছিঁড়িয়া যাইবে। যদি তুমি আমাকে বেশী জ্বালাতন করো তবে আমি এমন একজন লোককে খুঁজিয়া বাহির করিব যে তোমাকে ঠিক তেমনি করিবে যেমন তুমি বাজ খাঁকে করিয়াছিলে।

ঘলিওয়াজ খাঁ মধ্যস্থ হইয়া আমাদের মিট্‌মাট করিয়া দিল। কিন্তু আমরা পরস্পরকে এমন সব কথা বলিয়াছিলাম যে তাহার আঘাতে মন অনেকদিন টনটন করিতেছিল, এবং আমরা আগের মতন সদ্ভাব অনুভব করিতে পারিতেছিলাম না।

ইহার অল্পদিন পরে আমাদের অদৃষ্টের পড়্‌তা মন্দ হইল, ইংরেজের সিপাহীরা আমাদের অতর্কিতে আক্রমণ করিল। ঘলিওয়াজ খাঁ ও দলের আরো অন্য দুজন লোক মারা পড়িল,

দুজন ধরা পড়িয়া বন্দী হইল। আমি অত্যন্ত বে-মওকা রকম জখম হইয়া পড়িলাম এবং আমার প্রভুভক্ত বিশ্বাসী ঘোড়ার সাহায্য না পাইলে আমিও দুশ্‌মন্‌দের হাতে বন্দী হইতাম। পরিশ্রমে ক্লান্ত ও বন্দুকের গুলিতে আহত হইয়া আমি মরণাপন্ন অবস্থায় জঙ্গলে গিয়া লুকাইলাম, সঙ্গে মাত্র এক-জন সঙ্গী। ঘোড়া থেকে নামিয়াই আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম এবং আমার মনে হইল জখমী খরগোসের মতন আমি কোনো এক ঝোপের আড়ালে মরিয়া পড়িয়া থাকিব। আমার সঙ্গী আমাদের পূর্ব্বপরিচিত এক গুহার মধ্যে আমাকে রাখিয়া ফিরোজাকে খুঁজিতে গেল। সে তখন গুমান-পাসের মধ্য দিয়া ডেরা-ইস্‌মাইল খাঁ শহরের সওদাগরদের সঙ্গে কার্‌বার চালাইতে-ছিল। সে খবর পাইয়াই আমার কাছে ছুটিয়া আসিল। পনেরো দিন ধরিয়া সে এক মুহূর্ত্তও আমাকে ছাড়িয়া নড়ে নাই, এক-বার চোখের পাতা বুজে নাই; সে আমাকে এমন দরদ দিয়া নিপুণতার সহিত সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল যে তেমন যত্ন কোনো রমণী তাহার প্রিয়তম প্রণয়ীকে কখনো করিয়াছে কি না সন্দেহ। যেদিন আমি শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিলাম ফিরোজা সেইদিনই গোপনে আমাকে ডেরা-ইস্‌মাইল খাঁ শহরে লইয়া গেল। ইরাণী বেদেরা সকলেই আমাদের গোপন ও নিরাপদ্ আশ্রয় দিয়া সাহায্য করিতে লাগিল। সেখানে যে মিলিটারী অফিসার আমাকে ধরিবার জন্য তল্লাস করিবার ভার পাইয়াছিল তাহারই বাড়ীর দুখানা বাড়ীর পরের বাড়ীতে

আমি দেড় মাস কাটাইলাম ; কতদিন জান্‌লার চিকের আড়াল হইতে আমার গেরেপ্তারের জন্য ব্যস্ত সাহেবকে আমারই বাসার সম্মুখ দিয়া যাইতে দেখিয়াছি। অবশেষে আমি সুস্থ হইয়া উঠিলাম। আমি রোগশয্যায় শুইয়া শুইয়া দীর্ঘকালের চিন্তায় দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়াছিলাম যে এমন জীবন আর ভালো লাগে না—জীবনকে সংশোধন করিয়া অন্য ভাবে সাধু পথে যাপন করিবার চেষ্টা করিব। আমি ফিরোজাকে বলিলাম যে চলো আমরা এ দেশ ছাড়িয়া আফগানিস্তানে কি তুর্কীস্তানে চলিয়া গিয়া সং-পথে জীবন যাপন করি। ফিরোজা আমার প্রস্তাব শুনিয়া তাহার সর্ব্বনাশী হাসি হাসিয়া আমার কথা ফুৎকারে উড়াইয়া দিল।

ফিরোজা বলিল—আমরা জনারের ক্ষেতে মজুরী খাটিবার জন্য পয়দা হই নাই ; পরের ধনে পোদ্দারী করাই আমাদের অদৃষ্ট। দেখ, আমি ডেরা-ইস্‌মাইল-খাঁর সওদাগর মকবুল খাঁর সঙ্গে একটা সামান্য কারবারের বন্দোবস্ত করিয়াছি। কিছু মাল কাবুলে চালান করিয়া দিতে হইবে—সে তোমার সাহায্য পাইবার আশায় অপেক্ষা করিতেছে। সে জানে তুমি এখনো বাঁচিয়া আছ ; সে তোমার উপরই নির্ভর করিয়া আছে। তুমি যদি এখন রাজী না হও, আমার কথার খেলাফ্ হইলে আমাদের আর লোকের কাছে মুখ দেখাইবার জো থাকিবে না।

আমি ফিরোজার মন্ত্রণায় বশীভূত হইলাম ও আবার আমার বদ্‌মায়েসী আরম্ভ করিলাম।

সর্ব্বনাশের নেশা

যখন ডেরা-ইস্‌মাইল-খাঁ শহরে আমি লুকাইয়া ছিলাম, তখন একদিন শহরে এক সার্কাস আসিল। ফিরোজা সার্কাস দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া এক নও-জোয়ান পালোয়ানের খুব তারিফ করিতে লাগিল—সে বাঘের সঙ্গে খেলা করে; ফিরোজা তাহার নামও জানে—জালিম খাঁ, তাহার বয়স জানে—পঁচিশ, তাহার বাড়ী ঘর দেশের খবর জানে, তাহার জরির-কাজ-করা সদরী জামাটা তৈয়ার করাইতে কত খরচ পড়িয়াছিল সে খবরও তাহার অজানা ছিল না। মুখ্‌লিস খাঁ—যে সঙ্গীটি আমার অসুখের সময় হইতে আমার সঙ্গে আছে সে—আমাকে একদিন বলিল যে সে মকবুল খাঁর দোকানে জালিম খাঁর সঙ্গে ফিরোজাকে খুব হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতে দেখিয়াছে। এই খবরে আমি ভয় পাইয়া গেলাম। আমি ফিরোজাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—সে কেন ও কেমন করিয়া ঐ পালোয়ানটার সঙ্গে পরিচয় করিয়াছে ও ঘনিষ্ঠতা করিতেছে।

ফিরোজা বলিল—সে এমন একজন দৌলৎমন্দ্‌ লোক যাহার সঙ্গে আমরা কিছু লাভের কার্‌বার করিতে পারি। যে নদী শব্দ করে তাহার মধ্যে হয় জল আছে, নয় নুড়ি আছে। সেই সার্কাসওয়ালা খেলোয়াড় মুজফ্‌ফরগড়ের নবাবের সন্ত-ধরা বাঘের সহিত লড়িয়া বারো শত টাকা ইনাম পাইয়াছে। এখন দুই রকম হইতে পারে—হয় আমরা উহার টাকাটা ছিনাইয়া লইব, নয় টাকা সুদ্ধ লোকটাকে আমাদের দলভুক্ত করিয়া লইব—সে খুব জোরালো জোয়ান এবং সাহসী। দলে। অমুক অমুক লোক

মারা গিয়াছে, তাহাদের স্থান পূরণ করিতে হইবে ত। এই লোকটাকে তুমি দলে ভর্ত্তি করিয়া লও।

আমি বলিলাম—আমি উহার টাকা চাহি না, উহাকে ত চাহিই না। আর ইহাও চাহি না যে তুমি উহার সঙ্গে কথা বলো বা কোনো সম্পর্ক রাখো।

ফিরোজা বলিল—হুশিয়ার ইয়ার! আমাকে কিছু করিতে বারণ করিলেই তাহা শীঘ্র করা হইয়া যায়—এ যেন খেয়াল থাকে।

সৌভাগ্যক্রমে সেই বাঘ-খেলোয়াড় শের্‌মর্দ্দ্ লোকটা পেশোয়ারে চলিয়া গেল। আমি সওদাগরের মাল পার করিবার কাজে প্রবৃত্ত হইলাম। এই ব্যাপারে আমাকে ও ফিরোজাকে অনেক পরিশ্রম ও কৌশল করিতে হইয়াছিল। আমি পহল্‌বান জালিম খাঁর কথা ভুলিয়া গেলাম; বোধ হয় ফিরোজারও মনে ছিল না—অন্তত সে সময়ে সে তাহার কথা আর কিছু উত্থাপন করে নাই। ইহারই পরে সাহেব, আপনার সহিত আমার মুলাকাত হয়—প্রথমে সেই ঝরণার কাছে ও পরে ডাক্কা শহরে। আমাদের শেষ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমি কিছু বলিব না—আমার অপেক্ষা আপনিই বোধ হয় বেশী জানেন। ফিরোজা আপনার ঘড়ী ও চেন চুরি করিয়াছিল; সে আপনার টাকা ও বিশেষ করিয়া আপনার হাতের আংটিটা লইবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিল—আপনার হাতের আংটিটা নাকি জাদু-করা আংটি, সেইজন্য তাহার প্রবল লোভ হইয়াছিল। এইজন্য আমাদের

উভয়ের মধ্যে বিষম কাজিয়া হয়; তাহাকে কিছুতেই নিরস্ত করিতে না পারিয়া আমি তাহাকে মারি। এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে সে একেবারে বিবর্ণ ফ্যাকাশে হইয়া গেল এবং কাঁদিয়া ফেলিল। এই প্রথম তাহাকে কাঁদিতে দেখিলাম। তাহার চোখের জলে আমার মন গলিয়া গেল। আমি তাহার কাছে ক্ষমা চাহিলাম, মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলাম, কিন্তু সমস্ত দিন সে গোস্‌সা করিয়া থম্‌থম করিতে লাগিল এবং আমি যখন জম্‌রুদ যাইব বলিয়া তাহার নিকট বিদায় লইয়া চুম্বন করিতে গেলাম তখন সে মুখ ঘুরাইয়া লইল, আমাকে চুম্বন করিতে দিল না। আমি ভারী মন লইয়া রওয়ানা হইলাম। কিন্তু দুদিন পরেই দেখি ফিরোজা আমার কাছে আসিয়া হাজির, সে তাহার পূর্ব্বস্বভাব ফিরিয়া পাইয়াছে—বুল্‌বুলের মতন চঞ্চল, গানে আনন্দে মশ্‌গুল। সমস্ত বিরোধ ও বিষাদ আনন্দে ও প্রণয়ে ঢাকা পড়িয়া গেল—আমরা নবদম্পতির আনন্দে দুইদিন যাপন করিলাম। তাহার পর আবার আমাদের ছাড়াছাড়ির সময় সে বলিল—পেশোয়ারে জল্‌সা মেলা আছে; আমি উহা দেখিতে যাইতেছি; কাহার কাছে টাকা আছে খবর লইয়া তোমাকে খবর দিব।

আমি তাহাকে যাইতে দিলাম। কিন্তু সে চলিয়া গেলে আমি জল্‌সা মেলার কথা ভাবিতে লাগিলাম। যতই ভাবিতে লাগিলাম ততই আমি ফিরোজার শয়তানী বুঝিতে পারিতে লাগিলাম। সে যখন অমন খুশী মনে আমার কাছে ফিরিয়া

আসিয়াছিল তখন সে নিশ্চয় আমার হিংসার বদলে প্রতিহিংসা-সাধন করিয়া ফিরিয়াছিল। সে বলিয়াছিল—তাহার নাম ফিরোজা, সে ফিরোজা-রং আস্‌মানের মতন প্রমুক্ত স্বাধীন অ-ধর বন্ধনমুক্ত ; সে যখন নিজে যাচিয়া আমার কাছে ফিরিয়া আসিয়া ধরা দিয়াছে, তখন সে নিশ্চয় আমার উপর প্রতিহিংসা-সাধনের জয়ের উল্লাসের তাড়নাতেই আপনাকে ধরা দিয়াছে। আমার সমস্ত মন সন্দেহে বিষাইয়া উঠিল। একজন পথিক আমাকে খবর দিল যে পেশোয়ারে শেরের লড়াই হইবে। আমার সর্ব্বাঙ্গের রক্ত আগুন হইয়া ফুটিয়া উঠিল। আমি বে-আক্কেল, আহাম্মক, আমি ফিরোজার পিছে পিছে ছুটিয়া পেশোয়ারে আসিলাম। মেলার মধ্যে তাম্বু খাটাইয়া শের-লড়াই দেখানো হইতেছে ; আমি টিকিট কাটিয়া ভিতরে ঢুকিলাম। দেখিলাম একেবারে বাঘের খাঁচার কাছে বেড়ার ধারে ফিরোজা বসিয়া আছে—আর সেই জালিম খাঁ বাঘের খেলা দেখাইতেছে। ফিরোজার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া তাকাইয়া বুঝিতে আর বাকী থাকিল না যে আমার সন্দেহ একটুও মিথ্যা নয়, প্রণয়জ সন্দেহের ও আশঙ্কার অতিরঞ্জন নয়। জালিম খাঁ যেন ফিরোজাকেই তাহার শের-মর্দ্দী দেখাইতেছিল, আনন্দে উল্লাসে সে যেন হাল্কা হইয়া হাওয়ায় বিচরণ করিতেছিল। সে অন্যমনস্ক হইয়া খেলিতেছিল—কারণ তাহার মন ছিল ফিরোজার কাছে, চোখ ছিল ফিরেজোর দিকে, বাঘের দিকে তাহার খেয়াল রাখিবার তেমন অবসর ছিল না। সে একটু

অসাবধান হইতেই বাঘটা আমার প্রতিহিংসার মূর্ত্তি ধরিয়া জালিম খাঁকে আক্রমণ করিয়া একেবারে কাবু করিয়া ফেলিল। আমি ফিরোজার দিকে ফিরিয়া তাকাইলাম—ফিরোজা তাহার জায়গায় নাই। আমি তাহার সন্ধানে যে যাইব তাহার জো ছিল না। সমস্ত তাম্বুর লোক একেবারে খাঁচার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল—আমি সেই ভিড়ের ভিতর আটক পড়িয়া গিয়াছিলাম। বাহির হওয়া অসম্ভব দেখিয়া আমি অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইলাম; জালিম খাঁর দলের লোকেরা অনেক কষ্টে বাঘটাকে জখম করিয়া জালিম খাঁকে বাঘের কবল হইতে উদ্ধার করিল। বাঘ ও খেলোয়াড় দুজনেই জখম হওয়াতে খেলা ভাঙিয়া গেল। আমি বাহির হইয়া মেলায় ঘুরিয়া ফিরোজাকে খানিকক্ষণ খুঁজিলাম; কিন্তু তাহাকে কোথাও দেখিতে না পাইয়া, আমরা পেশোয়ারে আসিলে যে সরাইয়ে থাকি সেখানে গেলাম। সমস্ত সন্ধ্যা চুপ করিয়া অপেক্ষায় কাটিল। রাত্রেও ফিরোজার দেখা নাই। রাত্রি দুটার সময় ফিরোজা ফিরিয়া আসিল, এবং আমাকে সেখানে দেখিয়া একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

আমি তাহাকে বলিলাম—আমার সঙ্গে এস।

সে মাথা দুলাইয়া বলিল—বেশ! চলো।

আমি আমার ঘোড়া আনিলাম; এবং আমার কোলের কাছে তাহাকে চড়াইয়া আমরা এক ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া চলিলাম,—সমস্ত রাত আমরা ক্রমাগত ছুটিয়া চলিলাম—কেহ

একটিও শব্দ উচ্চারণ করিলাম না। প্রভাতে আমরা সেই সরাইয়ে পৌঁছিলাম—যে সরাইয়ে আমি আপনার সঙ্গে এক রাত্রি যাপন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম ও যেখানে আপনি দয়া করিয়া আমাকে রাহ্‌নুমার বিশ্বাসঘাতকতা হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। আমি ঘোড়া হইতে নামিয়া ফিরোজাকে ঘোড়া হইতে নামাইলাম ও তাহাকে বলিলাম—শোনো ফিরোজা, যাহা হইয়াছে হইয়াছে, আমি তাহার সম্বন্ধে কখনো কোনো উল্লেখ করিব না; আমি সব ভুলিয়া যাইব। কেবল তুমি কসম খাইয়া স্বীকার করো যে তুমি এই অনাচারের জীবন পিছনে ফেলিয়া আমার সঙ্গে তুর্কীস্তানে গৃহস্থালি পাতিতে যাইবে এবং সেখানে শান্ত হইয়া থাকিবে।

ফিরোজা ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল—না, আমি তুর্কীস্তানে যাইব না, আমি এখানেই বেশ আছি।

আমি বলিলাম—বেশ আছ, কারণ জালিম খাঁর কাছাকাছি আছ। কিন্তু সে যদি বাঁচিয়াও উঠে, আগের মতন তাহার সুরৎ ও তাকৎ আর থাকিবে মনেও স্থান দিয়ো না। যাক, তাহার কথায় আমার কাজ কি? আমি তোমার ইয়ারদের খুন করিতে করিতে হয়রান হইয়া গিয়াছি; এখন তোমাকেই খুন করিয়া তোমার ইয়ার-বাজী ঘুচাইয়া আমি নিশ্চিন্ত হইব।

ফিরোজা তাহার বুনো চোখের তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া বেশ শান্ত নিশ্চিন্ত ভাবেই বলিল—আমি গোড়া

থেকেই জানি যে তুমি আমায় খুন করিবে। যেদিন প্রথম তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয় সেই দিনই তুমি খুনের দায়ে আমাকে গেরেপ্তার করিয়াছিলে। তাহার পর যেদিন তুমি আমার প্রথম নিমন্ত্রণ রাখিতে আস সেদিন তোমাকে দরজা খুলিয়া দিতে গিয়া প্রথমেই চোখ পড়িয়াছিল মোল্লার উপর—সে সেই সময় পথ দিয়া যাইতেছিল। আজ পেশোয়ার হইতে আসিবার সময় কি কিছু দেখিতে পাও নাই ?—পথে একটা খরগোশ ঘোড়ার পেটের তলা দিয়া ছুটিয়া গিয়াছিল। এবং এখানে আসিয়া যেই নামিলাম অমনি একটা হুতুমপেঁচা বুমবুম করিয়া যমের ডঙ্কা বাজাইয়া দিয়াছে। তোমার হাতে মৃত্যু আমার অদৃষ্টে লেখা হইয়া রহিয়াছে।

আমি বলিলাম—ফিরোজা, ফিরোজা, সত্যই কি তুমি আমাকে আর ভালোবাস না ?

সে কোনো জবাব দিল না। সে মাটিতে আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া আঙুল দিয়া মাটির উপর আঁক কাটিতেছিল।

আমি কাতর স্বরে মিনতি করিয়া বলিলাম—ফিরোজা, এই সদা-শঙ্কা ও সদা-অশান্তির জীবন বদ্‌লাইয়া চলো আমরা এমন কোথাও গিয়া বাস করি যেখানে আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ থাকিবে না, জীবন শান্তিতে নিরুপদ্রবে কাটিবে। তুমি ত জানো, এখান থেকে বেশী দূরে নয়, এক গাছের তলে আমাদের কিছু টাকা পোঁতা আছে।

সে শাণ-দেওয়া ছুরীর ফলার নখের মতন একটু বক্র হাসি

ঠোঁটের কোণে চাপিয়া বলিল—আগে আমি, পরে তুমি—এ যে ঘটিবে তাহা আমি অনেক দিনই জানিতাম।

আমি আবার বলিলাম—বেশ করিয়া সমঝিয়া দেখ, ফিরোজা। আমার সহের সীমা তুমি ও আমি উভয়েই অতিক্রম করিয়া চলিয়াছি। মন স্থির করিয়া ফেলো, আমিও স্থির করি —হয় ইস্‌পার, নয় উস্‌পার!

ফিরোজা কোনো জবাব দিল না। আমি তাহাকে ছাড়িয়া নিকটের এক মস্‌জিদে গেলাম। গিয়া দেখিলাম মোল্লা নমাজ করিয়া কোরানের ফাতেহা পাঠ করিতেছেন—বিস্‌মিল্লাহ্‌-ইর্‌-রহ্‌মান-ইর্‌-রহিম! যে-কোনও গুণানুবাদ হউক না কেন, সমস্ত গুণানুবাদই জ্ঞানগোচর সমস্ত পদার্থের পালনকর্ত্তা আল্লাহ্‌র প্রশংসা ব্যতীত অন্যের গুণানুবাদ নহে। তিনি ইহকালে অসীম-অনুগ্রহ-প্রদর্শনকারী এবং পরকালে সীমাতীত দানকর্ত্তা। মরণের পর যখন মনুষ্যগণের কর্ম্মের বিচার হইবে, তিনি সেই বিনিময় প্রদানের সময়ের অধিপতি। হে সকল-বিদ্যমানের পালনকর্ত্তা, হে কর্ম্মফলদাতা পরমেশ্বর, আমরা মাত্র তোমারই উপাসনা করি এবং কেবল তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ্‌, ইহ-পরকালে যাহাতে মঙ্গল হয়, যাহা আমাদিগকে পূর্ণত্ব প্রদান করিতে পারে, এমন অবক্র পথে আমাদিগকে পরিচালিত করো। যাঁহাদের তুমি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছ তাঁহাদের পথে আমাদিগকে পরিচালিত করো। যাহারা তোমার অসন্তোষভাজন, যাহারা পথভ্রষ্ট, তাহাদের গম্য পথ হইতে

সম্পূর্ণ পৃথক্ পথে আমাদিগকে পরিচালিত করো।······লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহা-মুহম্মদ-উর্-রসুল্-উল্লাহ্!······

মোল্লার নমাজ ও পাঠ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত আমি সেইখানে অপেক্ষা করিলাম। আমারও ইচ্ছা হইতেছিল যে আমিও প্রার্থনা করি, কিন্তু মন এমন চঞ্চল হইয়াছিল যে পারিলাম না। যখন মোল্লা উঠিলেন, আমি তাঁহার নিকটে গিয়া বলিলাম—বাবা, একজন খুব বিপদাপন্ন লোকের কল্যাণের জন্য আপনি একটু প্রার্থনা করিবেন কি?

মোল্লা বলিলেন—বাচ্চা, আমি ত সকল দুঃখীর জন্যই প্রার্থনা করি। আল্লাহ্ বলিয়াছেন—"আমার নিকট প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিব।"

আমি বলিলাম—বাবা, যে আত্মা শীঘ্রই তাহার সৃষ্টিকর্ত্তার চরণে পৌছিবে, তাহার মঙ্গলের জন্য একটু প্রার্থনা করিতে পারিবেন কি?

মোল্লা আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিলেন—'আল্বৎ।' আমার ভাবভঙ্গীতে কিছু অস্বাভাবিকত্ব লক্ষ্য করিয়া তিনি আমার মনের অবস্থা জানিয়া লইবার জন্য কথা কহাইতে লাগিলেন—বাবা, তোমাকে যেন ইহার আগে কখন্ কোথায় দেখিয়াছি।

আমি সে কথার কোনো জবাব না দিয়া তাঁহার সম্মুখে একটা আশ্রফী রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—ফের আপনি কখন নমাজ পড়িবেন?

তিনি বলিলেন—এই আধ ঘণ্টা পরে। আচ্ছা বাচ্চা, তুমি সত্য করিয়া বলো ত তোমার মনে কি কিছু পীড়া দিতেছে? বাবা, আল্লাহ্ সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহার দয়ার কাছে কিছু গোপন করিবার চেষ্টা করিয়ো না।

আমার মন এমন কাতর ব্যাকুল হইয়া উঠিল যে মনে হইল আমি কাঁদিয়া ফেলিব। আমি কষ্টে বলিলাম—তাঁহার নমাজের সময় আমি আবার ফিরিয়া আসিব।

আমি মস্‌জিদ হইতে তফাতে আসিয়া এক জায়গায় ঘাসের উপর শুইয়া রহিলাম। কতক্ষণ পরে মুয়াজ্জিনের ডাক শুনিয়া উঠিলাম। আমি আবার মস্‌জিদে গেলাম, কিন্তু এবার আর ভিতরে প্রবেশ করিলাম না। কিছুক্ষণ পরে শুনিলাম মোল্লা বলিতেছেন—"তিনি মহাগ্রন্থে পুনঃ পুনঃ শিক্ষা দিতেছেন, মরণের পর তুমি অস্তিত্বহীন বিলুপ্ত ধ্বংস হইয়া যাও না। তোমার এই বাহ্যিক পরিচ্ছদ, তোমার আত্মার এই বাহন, এই শরীর মাত্র ধ্বংস হয়।......"

মোল্লার নমাজ শেষ হইয়া গেলে আমি সরাইয়ে ফিরিয়া আসিলাম। আমার মন যেন চাহিতেছিল ফিরোজা পলাইয়া যাক, মনে করিতেও যেন আনন্দ হইতেছিল যে ফিরোজা আমার ঘোড়া লইয়া পলাইয়া গিয়াছে। কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম সে ঠায় সেই একজায়গায় বসিয়া আছে। সে যে আমার কথায় ভয় পাইয়াছে এমন পরিচয় দিবার মেয়ে ত সে নয়। সে গুনগুন করিয়া মন্ত্র পড়িতে পড়িতে

একটা কাঠি দিয়া মাটিতে আঁক কাটিয়া কি সব তুকতাক করিতেছিল।

আমি তাহাকে বলিলাম—ফিরোজা, তুমি আমার সঙ্গে আসিবে?

সে কিছু না বলিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল; সে হাতের কাঠিটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ওড়্‌নাখানা মাথায় দিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। আমি ঘোড়া আনিয়া চড়িলাম, সে এবার আমার পিছনে চড়িল। আমরা রওয়ানা হইলাম।

কিছুদূর গিয়া আমি বলিলাম—আমার ফিরোজা, আমার জান্, তুমি আমার সঙ্গে যাইবে তবে?

ফিরোজা বলিল—হাঁ, তোমার সঙ্গে মৃত্যুর মুখে যাইব; কিন্তু তোমার সঙ্গে বাঁচিয়া থাকা আর চলিবে না।

আমরা এক নির্জ্জন পাহাড়ের প্রান্তরে আসিয়াছিলাম, আমি লাগাম টানিয়া ঘোড়া থামাইলাম।

ফিরোজা জিজ্ঞাসা করিল—এইখানে?

তার পর সে ঘোড়ার পিঠ হইতে লাফাইয়া মাটিতে নামিয়া পড়িল। তার পর সে মাথা হইতে ওড়্‌না খুলিয়া লইয়া পায়ের কাছে ফেলিয়া দিল এবং দুই হাত কোমরে দিয়া স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া স্তব্ধ নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইল।

আমি ঘোড়া হইতে নামিলে সে বলিল—তুমি আমাকে খুন করিবে। আমার বুঝিতে বাকি নাই। ইহা অদৃষ্ট-লেখা, ললাট-লিপি, কিস্‌মৎ! কিন্তু তা বলিয়া তুমি কিছুতেই আমাকে

তোমার অধীন করিতে পারিবে না। আমি ত বলিয়াছি—আমার নাম ফিরোজা, আমি ফিরোজা জহরের মতন বহুমূল্য যত্নলভ্য যত্নরক্ষিতব্য, আমি ফিরোজা আস্‌মানের মতন অ-ধর অনধিগম্য, আমি কালের মতন ফি-রোজা—নিত্য আমার নব নব বিকাশ, নূতনে আনন্দ, নূতনের আরাধনা। যে ফি-রোজা সে কখনো পুরাতন হয় না, সে নিত্য তাজা, সে সর্ব্বদা তর্ থাকে।

আমি বলিলাম—ফিরোজা ফিরোজা, এমন পাগলামি করিয়ো না, একটু বিবেচনা করো। আমার মিনতি রাখো—সব অতীত ভুলিয়া যাইতে দাও, তুমি ভুলিয়া যাও। তুমি জানো তোমার জন্য আমি কী ক্ষতি স্বীকার করিয়াছি—ইজ্জৎ ইমান্ দীন্ নিক্‌নাম আবরু সোহবৎ স্বভাব চরিত্র ধর্ম্ম কর্ম্ম ইহকাল পরকাল সব নষ্ট করিয়াছি—পদে পদে জীবন বিপন্ন করিয়াছি, তোমার মোহে আমি খুনী ডাকাত—সর্ব্বনাশের নেশায় আমি মত্ত জ্ঞানহারা! ফিরোজা, ফিরোজা, আমার ফিরোজা! আমাকে আর সর্ব্বনাশের পথে ঠেলিয়া দিয়ো না। আমার হাত হইতে তোমাকে বাঁচাও, সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও আমার হাত হইতে বাঁচাও! কত হত্যা করিয়াছি—স্ত্রীহত্যা আত্মহত্যা করাইয়ো না।

ফিরোজা গম্ভীর হইয়া বলিল—মীর খাঁ, যাহা অসম্ভব তাহা করিবার অনুরোধ করিয়া কোনো ফল নাই; অসম্ভব অনুরোধ ত রাখা যায় না। আমি তোমাকে আর একটুও ভালোবাসি না; তুমি আমাকে এখনো ভালোবাস তাই আমাকে খুন করিতে চাহিতেছ। আমি অনায়াসে মিথ্যা বলিয়া ছলনা করিয়া

তোমাকে ঠকাইতে পারিতাম; কিন্তু অত কষ্ট করার মজুরী পোষাইবে না! আমাদের সম্পর্ক চুকিয়া গিয়াছে। তুমি স্বামী, তোমার স্ত্রীকে বধ করিবার অধিকার তোমার আছে; কিন্তু ফিরোজা, সে ফি-রোজা, সে স্বাধীন দুর্দ্দম অবশ প্রমুক্ত! সে স্বাধীন ভবঘুরে বেদের ঘরে জন্মিয়াছিল, সে স্বাধীন থাকিয়াই মরিবে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—তবে তুমি জালিম খাঁকে ভালোবাস?

ফিরোজা বলিল—হাঁ তাহাকে আপাতত কিছুদিনের জন্য ভালো লাগিয়াছিল; তোমাকে যেমন কিছুদিন ভালো লাগিয়াছিল—বোধহয় তোমার চেয়ে ইহার প্রতি কম টানই হইয়াছিল। উপস্থিত এখন আর কাহারও প্রতি টান একটুও নাই, আমি এখন আমাকে ঘৃণা করিতেছি যে তোমাকে কোনোদিন ভালোবাসিয়াছিলাম।

সাহেব, আপনারা হিন্দুরা যেমন করিয়া ঠাকুরের পায়ে পড়েন আমি তেমনি করিয়া তাহার পায়ে পড়িলাম; আমি তাহাকে হাতে ধরিয়া মিনতি করিলাম; আমি চোখের জলে তাহার পা ধুয়াইয়া দিলাম; আমরা দুজনে একত্র যেসব দিন সুখে আনন্দে যাপন করিয়াছি তাহার স্মৃতি তাহার মনে উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম; তাহাকে খুশী করিবার জন্য আমরণ সমস্ত জীবন আমি ডাকাতিই করিব স্বীকার করিলাম। আমার সাধ্যে বুদ্ধিতে যাহা কুলাইল আমি সবই করিলাম,

সাহেব, সবই করিলাম :—আমি তাহাকে দেহ মন আত্মা ইহকাল পরকাল সব নির্ব্বিচারে সঁপিয়া দিয়া কেবল তাহার ভালোবাসা ভিক্ষা করিলাম। কিন্তু সে কি বলিল জানেন ?

সে বলিল—তোমাকে আর ভালোবাসা অসম্ভব ! আমি তোমার সহিত থাকিতে চাহি না, থাকিতে পারিব না !

সর্ব্বনাশের নেশা আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল, সব না খোয়া-ইয়া থামিবার আর ত উপায় ছিল না। তাহার কথায় আমার রক্তে আগুন লাগিয়া গেল ও আগুন-লাগা রক্তস্রোতে বান ডাকিয়া উঠিল, আমি আমার কোমরবন্দে ঝোলানো খাপ হইতে টানিয়া ছোরা বাহির করিলাম। তখনো আমার মনের পিছনে এই আশা উঁকি মারিতেছিল যে ছোরা দেখিয়া ফিরোজা একটু ভয় পাইবে, একবার একটু কাতর প্রার্থনা করিয়া বাঁচিতে চাহিবে। কিন্তু ও ত রমণী নয়—একেবারে শয়তানী !

তাহাকে অদম্য অবিচল দেখিয়া আমি বলিলাম—আখেরী সওয়াল তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—তুমি আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ আমার হইয়া থাকিবে কি না ?

ফিরোজা তাহার সেই ছোট ফর্শা পা মাটিতে ঠুকিয়া আমার হৃদয় বিদলিত করিয়া বলিয়া উঠিল—"না, না, না !" তার পর সে তাহার আঙুল হইতে আমার দেওয়া আংটিটা খুলিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

আমি তাহাকে দুবার উপরি উপরি ছোরা মারিলাম। এ ছোরা ফিরোজার প্রথম স্বামী বাজ খাঁর—তাহার সঙ্গে লড়াইয়ে

আমার ছোরা ভাঙিয়া গেলে তাহার ছোরাখানা আমি লইয়াছিলাম। দ্বিতীয় আঘাতের পর ফিরোজা মাটিতে পড়িয়া গেল —কিন্তু একটু টুঁ শব্দও সে উচ্চারণ করিল না! আমি এখনো তাহার সেই তাজ্জব-করা আজব-তর কালো টানা চোখের সেই স্থির অকুণ্ঠিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকানো দেখিতে পাইতেছি! অল্পক্ষণ পরেই সে দৃষ্টি বেদনা-ব্যাকুল হইয়া উঠিতেই সে চোখ বুজিয়া ফেলিল। আমি তাহার জখমী দেহের পাশে জখমী দিলের দরদে আচ্ছন্ন হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।

পূরা এক ঘড়ী আমি বেহুঁশ হইয়া তাহার পাশে পড়িয়া ছিলাম। যখন চেতনা হইল তখন মনে পড়িল ফিরোজা প্রায়ই বলিত যে জঙ্গলের মধ্যে তাহার যেন কবর হয়। গভীর জঙ্গলে তাহাকে কোলে করিয়া লইয়া গেলাম; সেখানে ছোরা দিয়া কবর খুঁড়িয়া তাহাকে মাটি দিলাম। তার পর অনেক ক্ষণ ধরিয়া অনেক খুঁজিয়া আমার আংটিটা কুড়াইয়া আনিলাম—সেটাও তাহার কবরে দিলাম। হয়ত তাহা আমার মূর্খতাই হইল।

তাহার পর আমি ঘোড়ায় চড়িয়া এক ছুটে ইংরেজমুলুকের সীমানায় আসিয়া প্রথম কোতোয়ালীতে গিয়া বলিলাম—আমি মীর খাঁ। আমি ফিরোজাকে খুন করিয়া আসিয়াছি।

সাহেব, নিজের হাতে নিজের সর্ব্বনাশ আমি করি... তুচ্ছ জান্‌টাকে আর বহিয়া বেড়াইব কাহার জন্য?

মীর খাঁ চুপ করিল। একটা অব্যক্ত বেদনায় তাহার আচ্ছন্ন গম্ভীর হইয়া গেল। আমার মনও এই খুনী ডাকাতের

দুঃখে থমথম করিতেছিল, আমিও চুপ করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। তখন পথ দিয়া একজন পথিক গান করিতে করিতে যাইতেছিল—

আশিক্ খুঁ-রিজ্ দশ্না ইস্ৎ কজ্-উ
কফ্ন্-ই-কুশ্ৎগান্ নৈয়াবুদ রঙ্গ্।

প্রণয় সে যে গুপ্তি-ছোরা গুপ্ত ঝরায় রক্ত।
খুন হল যে তার কাপড়ে রং দেখানো শক্ত!

—

এই লেখকের খেলা

উপন্যাস

১। স্রোতের ফুল
(দ্বতীয় সংস্করণ) ২।০

২। পরগাছা
(দ্বিতীয় সংস্করণ) ১h০

৩। যমুনা-পুলিনের ভিখারিণী
(তৃতীয় সংস্করণ) ১৲

৪। হেরফের
(দ্বিতীয় সংস্করণ) ১h০

৫। চোরকাঁটা
(দ্বিতীয় সংস্করণ) ২৲

৬। আলোক-লতা ১৷৷০

৭। বিয়ের ফুল ১h০

৮। দুই তার ১৷৷০

৯। আগুনের ফুল্‌কি
(ফরাশী উপন্যাসের অনুবাদ) ১৲

১০। দোটানা ২৷৷০

১১। মুক্তিস্নান ৩৲

১২। পঙ্কতিলক ১৷৷০

ছোটগল্প

১। পুষ্পপাত্র
(২য় সংস্করণ) ১।০

২। সওগাত
(২য় সংস্করণ) ১।০

৩। ধূপছায়া

৪। চাঁদমালা

৫। মণিমঞ্জীর

৬। কনকচুর

৭। বরণডালা

বিবিধ

১। বেদবাণী
(বেদ-পরিচায়ক পুস্তক)

২। মহাভারত
(কাশীরাম দাসের, সচিত্র)

৩। বিষ্ণুপুরাণ
(সচিত্র, দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৷০

৪। কাদম্বরী
(সচিত্র, ষষ্ঠ সংস্করণ)

৫। রত্নাবলী ।৵

৬। রাবেয়া [illegible]য় সংস্করণ)

৭। পারস্য-উপন্যাস
(সচিত্র)

৮। রবিন্‌সন ক্রুশো
(সচিত্র)

৯। ঈশপের গল্প
(সচিত্র)

১০। ভাতের জন্মকথা
(পদ্যে, সচিত্র)